

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Amena Begum

রোলঃ 21500659

০৫ অক্টোবর, ২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

Amena Begum
রোলঃ 21500659

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে Amena Begum, আইডিঃ 21500659 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নামঃ

ডিপার্টমেন্টঃ

প্রতিষ্ঠানঃ

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতী জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Amena Begum

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

০৫ অক্টোবর, ২০২৩ ইং

Amena Begum

আইডিঃ 21500659

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৭
সালাতের পরিচয়	৯
কুরআন ও হাদীসে সালাত	১০
সালাতের গুরুত্ব	১৩
সালাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী	১৭
সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহের বিবরণ	১৭
সালাতের নিয়ত	২৪
সালাতের ফরযসমূহের বিবরণ	২৪
সালাতের ওয়াজিব সমূহের বিবরণ	২৭
সালাতের সুন্নাত সমূহের বিবরণ	৩২
পুরুষ ও মহিলাদের সালাতের পার্থক্য	৩৭
মহিলাদের সালাতের ৯৯টি মাসায়েল	৪২
সালাত ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ	৪৯
যে সব কাজের দ্বারা সালাত নষ্ট হয় না	৫১
সালাতের উল্লেখযোগ্য কিছু মাকরুহ	৫১
সিজদায়ে সাহুর আহকাম	৫৩
সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ ও মাকরুহ সময়	৫৮
যে সব সময়ে নফল সালাত আদায় করা মাকরুহ	৬০
সালাত আদায়ের প্রাকটিকাল পদ্ধতি	৬২
সালাতে খুশু-খুযু অর্জনের পদ্ধতি	৬৪
সালাতের ফযিলত	৭০
নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে	৭৭
সালাত কখন অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে?	৮৩
আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে সালাতের বহুবিধ উপকারীতা	৮৮
সালাত আদায় না করার পরিণাম	৯৪

সালাতকে সালাফে সালাহীন কেমন মর্যাদাসম্পন্ন বিবেচনা করতেন	১০২
শেষ কথা	১০৮
তথ্যসূত্র	১১০

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ

النَّبِيِّينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ

কালিমার সাক্ষ্য দেওয়ার পর সালাতই ইসলামের অধিকতর গুরুত্ব ও তাগিদপূর্ণ রুকন বা স্তম্ভ এবং ইসলামের সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিকতা, প্রতীক ও উত্তম ইবাদত।

আল্লাহ সুবহা-নাহ্ তায়াল্লা বলেন,

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ ১৫) [الاعلا: ১৫, ১৬]

“নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।

(সূরা আল-আ'লা, ৮৭: (১৪-১৫))

আয়াতে উল্লিখিত “ফালাহ” শব্দটি এমন ব্যাপক যার অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বুঝায়। সালাতকে নামাজও বলা হয়। সালাত আরবি শব্দ & নামাজ ফারসি শব্দ।

সালাত আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। সালাত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার এক দুর্ভেদ্য দূর্গ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

(أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)

[العنكبوت: ৪৫]

“তুমি পাঠ কর কিताব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সালাত অবশ্যই অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।”

(সূরা আল-আনকাবুত, ২৯ : (৪৫))

বিগত শরী‘আতসমূহের মধ্য থেকেও কোনো শরী‘আত সালাতবিহীন ছিল না। আল্লাহ তা‘আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [ابراهيم: ٤٠]

“হে আমার রব! আমাকে সালাত প্রতিষ্ঠাকারী কর এবং আমার বংশধরদের মধ্যে থেকেও।”(সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৪০)

এবং ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

﴿وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ [مريم: ৩১]

“এবং তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।”(সূরা মারইয়াম, ১৯: ৩১)

এবং ইসমাঈল আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

٥٥: وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا [مريم]

“সে তার পরিজনবর্গকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষভাজন।”[সূরা মারইয়াম, ১৯: ৫৫]

যাবতীয় ফরয বিষয় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ফরয হয়েছে, কিন্তু সালাতের জন্য তাঁকে আল্লাহর নিকটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর সাথে কথপোকথন করেন এবং তাঁর প্রতি (পঞ্চাশ) ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেন। অতঃপর তা থেকে কমিয়ে ৫ ওয়াক্ত বাকী রাখা হয় যার নেকী ৫০ ওয়াক্তেরই সমান। সুবহানাল্লাহ, আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

সকল প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি তার এক নগণ্য বান্দিকে এমন একটি কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

আলহামদুলিল্লাহ ওয়ালিল্লাহিল হামদ।

এখানে আমার কোন ক্রেডিট নেই।সকল প্রশংসা,পবিত্রতা একমাত্র মহান রবের জন্য।দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি।

আমি এই লিখাটাকে নিজের জন্যই সেক্ষ রিমাইন্ডার হিসেবে নিয়েছি। নিজের গাফিলতি,কমতি গুলো মাইনেস করে নিজের লাইফকে উন্নত করার এক সুযোগ পেলাম।

একজন মুসলিম কি করে তার রবের সাথে কথা না বলে থাকতে পারে?

ওয়াল্লাহি সালাতের,সিজদাহর এই মজা,এই স্বাদ আর অন্য কিছুতেই নেই।

সালাতের পরিচয়

'সালাত' আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হলো,

الصلاة أي الدعاء والرحمة والإستغفار

দোয়া করা,ক্ষমা পার্থনা করা,দরুদ পাঠ করা,রহমত,ইত্যাদি।

وَوَصَّلَ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

আর তুমি তাদের জন্য দোয়া কর, নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনা স্বরূপ।'(সূরা তাওবা,৯:১০৩)

সালাতের সংজ্ঞা

সালাতের পারিভাষিক অর্থ-

وفي الشرع أقوال وأفعال تفتيح بالتكبير وتختتم بالتسليم بشرائط
مخصوصة

“কিছু পাঠ ও কিছু কাজ এর সমন্বয়ে বিশেষ একটি ইবাদত; যা [রুকু-সিজদা সহকারে] নির্ধারিত শর্তাবলি সহিত আদায় করা হয়, যা তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে শুরু করত; সালামের মাধ্যমে শেষ হয়। তাকে সালাত বলা হয়।(আল-ফিকহুল মুয়াসসার)

কালেমায়ে শাহাদাতের পর ইসলামের অন্যতম দ্বিতীয় রুকন সালাত। এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

সালাত ফরয হওয়া কুরআন, সুন্নাহ ও মুসলমানদের ইজমা (বা ঐকমত্য) দ্বারা প্রমাণিত; এ জন্য কোন মুসলিম যদি পাঁচ ওয়াক্ত বা কোন এক ওয়াক্ত সালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, তবে সে কাফের (মুরতাদ) ইসলাম থেকে বহিস্কৃত হিসাবে বিবেচিত।

কুরআন ও হাদীসে সালাত

ফজর-মাগরীব

আল্লাহ সুব. তাআলা বলেন,

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى
لِّلذَّاكِرِينَ

“আর দিনের দুই প্রান্তেই সালাত ঠিক রাখবে এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।(সূরা হুদ,৩৮:১১৪)

যোহর-আসর

আল্লাহ সুব. তাআলা বলেন,

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

“তোমরা সালাতের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ করে মধ্যবর্তী সালাতের।(সূরা বাকারা,২:২৩৮)

এশা

আল্লাহ সুব. তাআলা বলেন,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ
مَشْهُودًا

“সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়। (সূরা বনী ইসরাইল, ১৭:৭৮)

আল্লাহ সুব. তাআলা আরো বলেন,

فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ
تُظْهِرُونَ

“সুতরাং তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর সন্ধ্যায় (মাগরিব ও এশার সালাত দ্বারা) ও প্রভাতে (ফজর সালাত দ্বারা) এবং অপরাহ্নে (আসরের সালাতের দ্বারা) ও যোহরের (যোহরের সালাত দ্বারা) সময়। আর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সকল প্রশংসা তো তাঁরই।” (সূরা রুম, ৩০:১৭-১৮)

সূরা রুমের উক্ত আয়াতে একই সাথে ৫ ওয়াক্ত সালাতের সময় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর পবিত্রতা ও মহিমা প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম যে সালাত একথা সর্বজন স্বীকৃত বিষয়।

হাদীসে সালাত

ক. রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

بَيْنِي وَالْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجَّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ

“ইসলাম পাঁচটি জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত: আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সা. আল্লাহর রাসূল -এ সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত

প্রদান করা, সাওম পালন করা এবং বাইতুল্লাহ-এর হজ্ব করা।”(সহীহ বুখারী,০৮;সহীহ মুসলিম,১৬)

খ. তালহা ইবনে ‘উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নাজদের বাসিন্দা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর খিদমাতে আসলো। তার মাথার চুলগুলো ছিল এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ত। আমরা তার গুন গুন আওয়াজ শুনছিলাম কিন্তু সে কী বলছিল তা বুঝা যাচ্ছিলো না। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অতি নিকটে এসে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল।

خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ " لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ وَصِيَامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ فَقَالَ " لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ

“রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ ‘দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত’সে বলল, এ ছাড়া আমার কোন কিছু (সালাত) আছে কি? তিনি বললেন, না তবে নফল আদায় করতে পার।

(সহীহ মুসলিম,৮)

গ. সালাত হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন এবং পাপ মোচনের নদী: আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بَبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟» قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا

“মনে কর তোমাদের কারো দরজার সামনে যদি একটি নদী থাকে, এতে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তাহলে তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে কি? তারা বললেন: জি না, তার শরীরে কোনো ময়লা থাকতে পারে না। তিনি বললেন: এমনিভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ, এর দ্বারা আল্লাহ সকল পাপ মোচন করে দেন।

(সহীহ বুখারী,৫২৮;সহীহ মুসলিম,৬৬৭)

ঘ. রাসূলুল্লাহ সা. বলেন,

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ

“যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহর সাথেই নিভূতে আলাপ করে।(সহীহ বুখারী,৩৯০)

ঙ. নবী কারীম সা. এর আরো এরশাদ করেন,

بَيِّنَ الرَّجُلُ وَالْكَفْرَ وَالشِّرْكَ تَرْكُ الصَّلَاةِ

“ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ছেড়ে দেয়া।(মুসলিম)

সালাতের গুরুত্ব

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ এবং তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি সাক্ষ্য প্রদানের পর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি সর্বপ্রথম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে দায়িত্বটি অর্পিত হয়- তা হলো সালাত । পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গাতে ঈমান ও তাওহীদের পর প্রথম ফরয আমল হিসেবে সালাতের কথা আলোচনা হয়েছে। সূরা বাকারার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে হিদায়াত অর্জনকারী দলের বর্ণনা করা হয়েছে।আল-কুরআনের শুরুতেই সালাতের নির্দেশ

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে।(সূরা বাকারা,২:৩)

কুরআনের অন্যত্রো যারা ঈমান গ্রহণ করে না এবং সালাত আদায় করে না তাদের উভয়ের অপরাধের কথা একই বিন্যাসে বর্ণিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন-

فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى

তারা ঈমানও গ্রহণ করে না এবং সালাতও আদায় করে না।(সূরা কিয়ামাহ,৭৫:৩১)

ইসলাম গ্রহণ করার পর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা। একজন মুসলিমের জন্য সালাত আদায়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর

কিছু নেই। যে তার সালাতকে হেফাজত করল, সে নিজের দ্বীনকে হেফাজত করল।
যে সালাতকে অবহেলা করল, সে নিজের দ্বীনকেই অবহেলা করল। নবী সল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ ، وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ

“সবকিছুর মূল হলো ইসলাম এবং সালাত হলো তার স্তম্ভ (খুঁটি)। (তিরমিযি, আস
সুনান: ২৬১৬)

আমরা এমন একটি তাঁবুর কথা চিন্তা করি, যার মাঝখানে কোনো খুঁটি নেই। কোনো
তাঁবুর মাঝখানের খুঁটিটি সরিয়ে নেওয়া হলে সেটি ভূপাতিত হবে। তাঁবুটির আর কোনো
মূল্য থাকবে না। চিন্তা করি, মাঝখানের খুঁটি ছাড়া আমরা কি তাবুটি উঠাতে
পারবো? আমরা যারা নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে, আমাদের জন্য সালাত এই
খুঁটির মতো।

আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে, পাঠানো হয়েছে এ পৃথিবীতে।
আল্লাহর ইবাদত করার সহজ মাধ্যম হলো সালাত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন-জাতি সৃষ্টি করেছি। (সূরা আয-
যারিয়াত, ৫১:৫৬)

মহান আল্লাহর ইবাদত করার জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের চেয়ে সরল ও সহজ
অন্য কোনো পথ নেই।

সালাত ছাড়া ইসলামের সব বিধান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম-এর ওপর নাযিল হয়েছে জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর মাধ্যমে। কিন্তু
সালাতের ক্ষেত্রে কী হয়েছে? সালাতের আদেশ দেওয়ার জন্য নবী মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সাত আসমানের ওপর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সালাতের
আদেশ ওপর থেকে নেমে আসেনি, সালাতের আদেশের জন্য নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লাম-কে আসমানের ওপর উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায তাঁর বাড়িতে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। এ সময় তাঁকে একটি ভ্রমণের জন্য জাথ্রত করা হয়। তাঁকে বুরাকের মাধ্যমে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় জেরুজালেমে। তারপর জেরুজালেম থেকে নিয়ে যাওয়া হয় সাত আসমানে। এ ঘটনাকে আমরা বলি আল-ইসরা ওয়াল মি'রাজ। জিবরীল আলাইহিস সালাম-এর সাথে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি আসমানে যান। জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁকে বিভিন্ন কিছু ঘুরিয়ে দেখান এবং পরিচয় করিয়ে দেন অন্যান্য নবী আলাইহিমুস সালামদের সাথে। তিনি জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীদেরও দেখেন। সবশেষে সপ্তম আসমানে জিবরীল আলাইহিস সালাম বলেন, আমাকে এখন ফিরে যেতে হবে। আমার সীমানা এতটুকুই। পরের ধাপটি অতিক্রম করতে পারবেন একমাত্র আপনিই। আপনিই কেবল এই সীমানা পেরিয়ে যেতে পারবেন!

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গেলেন এবং আল্লাহ তাআলা তখন সালাতের বিধান দিলেন। আল্লাহ তাআলা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললেন, আপনাকে ৫০ ওয়াক্ত সালাত দেওয়া হলো। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আদেশ নিয়ে সপ্তম আসমান থেকে ষষ্ঠ আসমানে নেমে এলেন। সেখানে দেখা হলো মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে। কী ঘটেছে জানার পর মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি ফিরে যান এবং আল্লাহ তাআলাকে অনুরোধ করেন সালাতের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার জন্যে। লোকদের ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা আছে, আমি জানি তারা কেমন! তারা কোনোভাবেই ৫০ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারবে না। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে গিয়ে আল্লাহর কাছে অনুরোধ করলেন। মহান আল্লাহ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতকে কমিয়ে চল্লিশ করলেন। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নেমে আসার পর মুসা আলাইহিস সালাম প্রশ্ন করলেন, কী হলো?

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন, আল্লাহ সালাতের সংখ্যা কমিয়ে চল্লিশ করে দিয়েছেন। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি আবার ফিরে যান এবং এর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়ার জন্য পুনরায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে অনুরোধ করুন। মুসা আলাইহিস সালাম কেন এই কথা বলছেন? কারণ এ ব্যাপারে তাঁর

অভিজ্ঞতা আছে। তিনি দেখেছেন বনী ইসরাঈলের আচরণ। তাই তিনি বুঝতে পারছিলেন এ পরিমাণ সালাত আদায় করা মানুষের জন্য কঠিন হবে। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও ফিরে গেলেন। এবার চল্লিশ থেকে কমিয়ে ত্রিশ করা হলো। তারপর আবারও মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে একই কথোপকথন হলো। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবারও ফিরে গেলেন। এভাবে ত্রিশ থেকে কমে বিশ, বিশ থেকে দশ হলো। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবার নেমে আসার পর মূসা আলাইহিস সালাম-এর সাথে তিনি কথা বলতেন, আর মূসা আলাইহিস সালাম বলতেন ফিরে যান এবং আল্লাহকে বলুন আরও কমিয়ে দিতে। যখন সালাতের সংখ্যা কমিয়ে দশ ওয়াক্ত করা হলো তখনও মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি ফিরে যান এবং আল্লাহকে অনুরোধ করুন আরও কমিয়ে দিতে। মহান আল্লাহ দশ ওয়াক্ত থেকে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করলেন এবং বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত যার পুরস্কার পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান। তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে কিন্তু এর সওয়াব হবে পঞ্চাশের সমান। (বুখারী, আস-সহীহ: ৩১০৬)

এটাই চূড়ান্ত হয়।

এই সালাত ৫০ ওয়াক্ত ছিল। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত মাত্র অল্প সময়ে আদায় করা যায়, কিন্তু এ থেকে সওয়াব পাওয়া যায় পঞ্চাশ ওয়াক্তের।

যখন আমরা চিন্তা করবো প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাতের বিধান দেওয়া হয়েছিল, পরে তা কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করা হয়েছে, এবং এর মাধ্যমে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সওয়াবই পাওয়া যাচ্ছে, তখন আমরা বুঝবো আল্লাহ আমাদের প্রতি কত দয়াবান এবং কত সহজ।

সালাতের আদেশ দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উঠিয়ে নিয়েছেন সপ্তম আসমানের ওপরে। যখন সালাতের আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মধ্যে কোনো মাধ্যম ছিল না। এ থেকে বুঝা যায় সালাত কতটা মূল্যবান...

সালাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী

যার মাঝে একসাথে তিনটি শর্ত পাওয়া যাবে, তার উপর সালাত ফরয হবে। যার মাঝে একসাথে তিনটি শর্ত পাওয়া যাবে না, তার উপর সালাত ফরয হবে না। শর্ত তিনটি হচ্ছে এই-

১. মুসলিম হওয়া। অতএব অমুসলিমের উপর সালাত ফরয নয়।

২. সাবালক হওয়া। অর্থাৎ ছেলেদের ক্ষেত্রে ১২/১৩ বৎসর হওয়া, আর মেয়েদের ক্ষেত্রে ১০/১১ বৎসর হওয়া। সুতরাং বালগ হওয়ার আগে সালাত ফরয নয়। তবে ছোটদেরকে সাত বছরের সময় থেকেই তাদেরকে সালাতের আদেশ করতে হবে। যখন তারা ১০ বছরে উপনীত হবে তখন অবশ্যই সালাত পড়তে বাধ্য করতে হবে। সালাত না পড়লে শাসন করতে হবে। যেন সালাত ফরয হওয়ার পূর্ব থেকেই তারা সময় মতো সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব রাদি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ
وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের আদেশ কর তারা সাত বছর বয়সে উপনীত হলে। তাদেরকে শাসন কর তারা দশ বছর বয়সে উপনীত হলে। তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (সুনানু আবু দাউদ, ৪৯৫)

৩. আকল বা জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। অতএব অজ্ঞান, পাগলের উপর সালাত ফরয নয়।

সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহের বিবরণ

এখানে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা মূল সালাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য তা আবশ্যিক। যদি ঐ বিষয় সমূহের কোন একটি ছুটে যায় তাহলে সালাত

শুদ্ধ হবে না। ঐ সব বিষয়কে সালাতের শর্ত বলে অভিহিত করা হয়। আর তা হচ্ছে সাতটি।

১. শরীর পবিত্র হওয়া:

সালাত আদায়কারী ব্যক্তির শরীর পবিত্র হওয়া।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهَرُوا

যদি তোমরা অপবিত্র হও তাহলে পুরো দেহ পবিত্র করো। (সূরা মায়িদাহ, ৫:৬)

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

তোমাদের কেউ ওযু নষ্ট করলে পুনরায় ওযু করার পূর্ব পর্যন্ত তোমাদের সালাত হবে না। (সহীহ মুসলিম, ৫৫৯)

২. কাপড় পবিত্র হওয়া :

সালাত আদায়কারী ব্যক্তির কাপড় পবিত্র হওয়া।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَوَيْتَابَكَ فَطَهِّرْ

আপনার কাপড় পবিত্র করুন। (সূরা মুদাসসির, ৭৪:৪)

৩. সালাতের স্থান পবিত্র হওয়া:

অর্থাৎ যে স্থানে সালাত পড়া হবে সে স্থানটি পবিত্র হওয়া। আর স্থান পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে দুই পা, দুই হাত ও দুই হাটু এবং কপাল রাখার স্থান পবিত্র হওয়া অত্যাবশ্যিক।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ

السُّجُودِ

আমি ইবরাহীম এবং ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার ঘরকে তওয়াফকারী, ইতিকাফকারী এবং রুকু সাজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ । (সূরা বাকারাহ,২;১২৫)

৪. সতর ঢাকা:

অতএব, সতর ঢাকা সম্ভব হলে যদি সতর না ঢাকে তাহলে সালাত শুদ্ধ হবে না। সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সতর ঢাকা আবশ্যিক। সালাতের মাঝখানে এক রুকন আদায় করার সময় পর্যন্ত শরীরের কোনো অঙ্গের এক চতুর্থাংশ খুলে গেলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় এমন পোশাক পরিধান করো যাতে তোমাদের সতর ঢেকে থাকে । (সূরা আরাফ,৭;৩১)

পুরুষের সতরের পরিমাণ:

পুরুষের সতরের পরিমাণ হচ্ছে, নাভির নীচ থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত। সুতরাং হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসে এসেছে-

فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ

পুরুষের নাভির নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতরের অন্তর্ভুক্ত। (মুসনাদে আহমদ;৬৭৫৬)

হযরত আমর ইবনে শুআইব রাহ. তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কোনো পুরুষ অপর পুরুষের সতরের দিকে তাকাবে না। পুরুষের সতর হল নাভির নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত। (সুনানে কুবরা, বায়হাকী, হাদীস : ৩২৩৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৪৯৭; সুনানে দারা কুতনী ১/৩২০)

নামাযের মধ্যে পুরুষের সতর হল, পেট ও পিঠ ঢাকার সাথে সাথে নাভি থেকে টাখনুর নিচ পর্যন্ত ঢেকে রাখা।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: «أَوْكُلْكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ» ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: «إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا»، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ، وَقَمِيصٍ فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرََاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرََاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرََاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي ثُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، فِي ثُبَّانٍ وَقَمِيصٍ،

আবু হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট দাঁড়িয়ে এক কাপড়ে সালাত আদায়ের হুকুম জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের নিকট কি দু'খানা করে কাপড় আছে? অতঃপর এক ব্যক্তি 'উমার (রাযি.)-কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেনঃ আল্লাহ যখন তোমাদের সামর্থ্য দিয়েছেন তখন তোমরাও নিজেদের সামর্থ্য প্রকাশ কর। লোকেরা যেন পুরো পোশাক একত্রে পরিধান করে অর্থাৎ মানুষ লুঙ্গি ও চাদর, লুঙ্গি ও জামা, লুঙ্গি ও কাবা, পায়জামা ও চাদর, পায়জামা ও জামা, পায়জামা ও কাবা, জাগিয়া ও কাবা, জাগিয়া ও জামা পরে সালাত আদায় করে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩৬৫]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وَعَلَيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَاسْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «مَا السُّرَى يَا جَابِرُ» فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: «مَا هَذَا الْإِسْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ»، قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ - يَغْنِي ضَاقَ - قَالَ: «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ»

সাঈদ ইবনু হারিস (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমরা জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রাযি.)-কে একটি কাপড়ে সালাত আদায় করা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেনঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সঙ্গে কোন এক সফরে বের হয়েছিলাম। এক রাতে আমি কোন দরকারে তাঁর নিকট গেলাম। দেখলাম, তিনি সালাতে রত আছেন। তখন আমার শরীরে মাত্র একখানা কাপড় ছিল। আমি কাপড় দিয়ে শরীর জড়িয়ে নিলাম আর তাঁর পার্শ্বে সালাতে দাঁড়ালাম। তিনি সালাত শেষ করে

জিঞ্জেস করলেনঃ জাবির! রাতের বেলা আসার কারণ কী? তখন আমি তাঁকে আমার প্রয়োজনের কথা জানালাম। আমার কাজ শেষ হলে তিনি বললেনঃ এ কিরূপ জড়ানো অবস্থায় তোমাকে দেখলাম? আমি বললামঃ কাপড় একটিই ছিল (তাই এভাবে করেছি)। তিনি বললেনঃ কাপড় যদি বড় হয়, তাহলে শরীরে জড়িয়ে পরবে। আর যদি ছোট হয় তাহলে লুঙ্গি হিসেবে ব্যবহার করবে।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৩৬১)

নারীদের সতরের পরিমাণ:

নারীদের সতরের পরিমাণ হচ্ছে, মুখমন্ডল, উভয় হাতের তালু এবং উভয় পা ব্যতীত সমস্ত শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা ঢেকে রাখা ফরয।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে। (সূরা নূর, ২৪; ৩১)

হাদীসে এসেছে-

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ

মহিলাদের পুরো দেহ সতরের অন্তর্ভুক্ত। (সুনানুত তিরমিযি: ১১৭৩)

নোট: তিরমিযির হাদীসে মহিলাদের পুরো দেহ সতরের অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে। তবে উপরের আয়াতটিতে সাধারণত যা প্রকাশমান এর ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য হাদীস থেকে মহিলাদের মুখমন্ডল, উভয় পা এবং হাতের তালুকে সতর থেকে বাইরে রাখা হয়েছে।

(উত্তম---চেহারা ব্যতীত হাত পা সহ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখা)

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ . " ۝

‘আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা খিমার (ওড়না) ছাড়া সালাত আদায় করলে আল্লাহ তার সালাত কবুল করেন না। (আবু দাউদ, ৬৪১)

৫. কিবলামুখী হওয়া:

অতএব কিবলামুখী হওয়া সম্ভব হওয়ার পরও যদি কিবলামুখী হওয়া ছাড়া সালাত আদায় করা হয় তাহলে সালাত শুদ্ধ হবে না। যে ব্যক্তি মক্কা অবস্থান করেন এবং বাইতুল্লাহ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম, তার জন্য মূল বাইতুল্লাহ-ই হলো কিবলা। আর যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম নন, তার জন্য বাইতুল্লাহর দিকই কিবলা।

যে ব্যক্তি রোগ বা শত্রুর আশংকায় কিবলামুখী না হতে পারবে সে ব্যক্তির জন্য যদিও সুযোগ হয়, সেদিকে মুখ করে সালাত আদায় করা জায়েয আছে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَمَنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

আর তোমরা যেখান থেকেই (সফরের জন্য) বের হও, (সালাতের সময়) নিজেদের মুখ মাসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও। (সূরা বাকারা, ২:১৪৯)

৬. সালাতের সময় হওয়া:

অতএব সালাতের সময় আসার পূর্বে সালাত আদায় করা শুদ্ধ নয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا

নিশ্চয় সালাত মুমিনদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (সূরা নিসা, ৪:১০৩)

৭. নিয়ত করা:

অতএব নিয়ত করা ব্যতীত সালাত শুদ্ধ হবে না ।

হাদীসে এসেছে-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ

মানুষের সমস্ত ভালো কাজের ফলাফল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রতিটি মানুষ তাই পাবে যা সে নিয়ত করে।(সহীহ বুখারী,১)

সালাত যদি ফরয হয় তাহলে নিয়তের ক্ষেত্রে সেটা কোন সালাত তা নির্দিষ্ট করা অত্যাৱশ্যক। যেমন যোহরের সময় যোহরের সালাতের নিয়ত করা। আসরের সময় আসরের সালাতের নিয়ত করা।

আর সালাত যদি ওয়াজিব হয়, তাহলেও নিয়তের ক্ষেত্রে সেটা কোন সালাত তা নির্দিষ্ট করা অত্যাৱশ্যক। যেমন, বিতরের সালাত আদায় করার সময় বিতরের ওয়াজিব সালাতের নিয়ত করা। ঈদের সালাত আদায় করার সময় ঈদের ওয়াজিব সালাতের নিয়ত করা।

তবে যদি সালাত নফল হয়, তাহলে তা কোন সালাত আদায় করা হচ্ছে তা নির্দিষ্ট করা অত্যাৱশ্যক নয়। বরং শুধু সালাতের নিয়ত করলেই

চলবে।

আর যদি কেউ ইমামের পিছনে মুক্তাদি হয়ে সালাত আদায় করে তাহলে ইমামের অনুসরণের নিয়ত করা আবশ্যক।

নিয়ত করতে হবে তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে। তাকবীরে তাহরীমার পরে নিয়ত করলে চলবে না।

সালাতের নিয়ত

কোনো সালাতের জন্য আরবিতে, বাংলাতে কিংবা অন্য কোনো ভাষাতে মুখে উচ্চারণ করে নিয়ত জরুরী নয়। কারণ, নিয়ত হলো মনের ইচ্ছা, সংকল্প, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। সুতরাং কোনো সালাতের জন্য নিয়ত করার অর্থ হলো সেই সালাতের নাম এবং রাকাতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

আমাদের বাংলাদেশে ছোট-ছোট কিছু অগ্রহণযোগ্য বই পুস্তকে সালাতের আরবি নিয়তের কথা পাওয়া যায়। সে সব কথা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। কারণ, হাদীসে এভাবে নিয়ত করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এছাড়া যারা আরবি না জানেন তারা আরবিতে নিয়ত করতে গিয়ে অনেক সময় ভুল বলেন। রাকাতের ক্ষেত্রে দুয়ের পরিবর্তে চার বলে ফেলেন। আবার কখনও ফরযের ক্ষেত্রে সুন্নত বা নফল বলে ফেলেন।

কিছু মানুষ এমনও আছে যারা আরবি নিয়ত না জানার ভয়ে মসজিদে যায় না। সুতরাং এত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে সহজে সালাতের নাম এবং রাকাতের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সালাত শুরু করবেন।

সালাতের ফরযসমূহের বিবরণ

এখানে এমন কিছু বিষয় রয়েছে, যা মূল সালাতের অন্তর্ভুক্ত। সালাত আদায় হওয়ার জন্য তা আবশ্যিক। যদি ঐ বিষয় সমূহের কোন একটি ছুটে যায় তাহলে সালাত আদায় হবে না। ঐ সব বিষয়কে সালাতের ফরয বলে অভিহিত করা হয়। আর তা হচ্ছে ছয়টি।

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা:

যেমন, আল্লাহ্ আকবার শব্দ দিয়ে সালাত শুরু করা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ

আপনি আপনার রবের মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন। (সূরা মুদাসিসর, ৭৪;৩)

(وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى)

আপনি আপনার রবের নাম স্মরণ করুন। সালাত আদায় করুন। (সূরা আলা, ৮৭;১৫)

নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমার মাঝখানে এমন কাজ করবে না, যা সালাতের পরিপন্থী। যেমন খাওয়া, পান করা বা অন্য কোনো কথা বলা ইত্যাদি। তাকবীরে তাহরীমা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো এমন আওয়াজে বলতে হবে যেন তা নিজে শুনতে পারে।

তাকবীরে তাহরীমা উচ্চারণের পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কিছুই পড়তেন না। এমনকি মুখে নিয়তও উচ্চারণ করতেন না। (যাদুল মায়াদ)

২. দাঁড়িয়ে সালাত পড়া

অকারণে বসে সালাত আদায় করলে তা আদায় হবে না। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

(َوَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)

মহান আল্লাহর সামনে একান্ত আদবের সাথে দাঁড়াও। (সূরা বাকারা, ২;২৩৮)

হাদীসে এসেছে-

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَلَى جُنُبٍ

হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অশ্বরোগ ছিল। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাত (আদায় করার পদ্ধতি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে সালাত পড়বে। তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে বসে সালাত আদায় পড়ো। আর যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে হেলান দিয়ে সালাত পড়ো। (সহীহ বুখারী, ১১১৭)

৩.কিরাআত পড়াঃ

সালাতের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াত করা। কমপক্ষে ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ

কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্যে সহজ ততটুকু পড়ো। (সূরা মুজাম্মিল, ৭৩; ২০)

হাদীসে এসেছে-

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ

কিরাআত (কুরআন থেকে পড়া) ছাড়া সালাত হবে না। (সহীহ মুসলিম, ৯০৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিরাআত ছিল টানা টানা তিনি প্রতিটি আয়াত পাঠ করে থামতেন। আয়াত শেষ করার সময় একটু টানা আওয়াজে শেষ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় রাকাতের তুলনায় প্রথম রাকাতের কিরাত দীর্ঘ করতেন। ফজরে সালাতসহ প্রত্যেক সালাতেই এমনটা করতেন। কখনো কখনো প্রথম রাকাতকে এতো দীর্ঘ করতেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত লোকদের মসজিদে আসার আওয়াজ শোনা যেত ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি কিরাত দীর্ঘ করে পড়তেন। (যাদুল মায়াদ)

৪. রুকু করা:

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

(وَازْكُرُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)

তোমরা রুকুকারীদের সঙ্গে রুকু কর। (সূরা বাকারা, ২; ৪৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকুতে গিয়ে এতো দীর্ঘ সময় থাকতেন যে প্রায় দশবার তাসবীহ পড়া যেতো। সাজদাতেও তিনি এই পরিমাণ সময়ই তাসবীহ পড়তেন।

৫. দুই সাজদাহ করা:

প্রত্যেক রাকআতে দুই সাজদা করা।

মহান আল্লাহ রাক্বুল আলামীন বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু কর এবং সাজদাহ কর। (সূরা হজ্জ, ২২; ৭৭)

৬. শেষ বৈঠক করা:

সালাতে তাশাহুদ পড়ার পরিমাণ সময় দেবী করা।

হাদীসে এসেছে-

إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ

(রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদি. এর হাত ধরে তাকে তাশাহুদ শিক্ষা দিলেন। তারপর বললেন, যখন তুমি এটি (তাশাহুদ) পড়বে অথবা এমন করবে তাহলে তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। (সুনানু আবু দাউদ, ৯৭২)

সালাতের ওয়াজিব সমূহের বিবরণ

১. সূরা ফাতিহা পড়া

ফরজের প্রথম দুই রাকআতে এবং বিতর ও নফল সালাতের সকল রাকআতে সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করা।

হাদীসে এসেছে-

مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأَمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خَدَاجٌ فَهِيَ خَدَاجٌ

غير تمام

যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ছাড়াই সালাত আদায় করল তা ত্রুটিপূর্ণ। তা ত্রুটিপূর্ণ। তা ত্রুটিপূর্ণ। অপূর্ণাঙ্গ। (সহীহ মুসলিম, ৯০৪)

২. সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য কোনো সূরা মিলানো:

ফরজের প্রথম দুই রাকআতে এবং বিতর ও নফল সালাতের সকল রাকআতে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য সূরা বা বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত তিলাওয়াত করা।

হাদীসে এসেছে-

أَمَرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَبَسَّرَ

(হযরত আবু সাঈদ রাদি. বলেন:) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সূরা ফাতিহার সাথে যতটুকু সম্ভব পড়ার জন্য আদেশ করেছেন। (সুনানু আবু দাউদ, ৮১৮)

৩. তাদিলে আরকান বা প্রতিটি রুকনকে প্রশান্তভাবে আদায় করা:

সালাতের মধ্যে কিয়াম, কিরাআত, রুকু এবং সাজদাসহ প্রতিটি আহকাম প্রশান্তভাবে আদায় করা।

দীর্ঘ হাদীসে বলা হয়েছে-

ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا

হযরত আবু হুরায়রা রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন একজন সাহাবি এসে সালাত আদায় করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করলেন। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি আবার সালাত আদায় করো। তুমি তো সালাত আদায় কর নি। তিনি ফিরে গিয়ে আগের মতো আবার সালাত আদায় করলেন। তারপর এসে সালাম করলেন। তিনি আবারও তাকে বললেন, তুমি সালাত আদায় কর। তুমি তো সালাত আদায় কর নি। তাকে এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবি বললেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি তো এর চেয়ে সুন্দর করে

সালাত আদায় করতে জানি না। আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন: যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে। তারপর কুরআন থেকে যা তোমার জন্য সহজ হয় তা পড়বে। তারপর রুকুতে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকু আদায় করবে। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর ধীরস্থিরভাবে সাজদাহ করবে। তারপর সাজদাহ থেকে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর এভাবেই পূর্ণ সালাত শেষ করবে।

(সহীহ বুখারী, ৭৫৭)

৪. সালাতের রুকন আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা:

সালাতের মধ্যে কিয়াম, কিরাআত, রুকু এবং সাজদাসহ প্রতিটি আহকাম ধারাবাহিকভাবে আদায় করা। (সহীহ বুখারী, ৭৫৭)

৫. প্রথম বৈঠক করা:

হযরত আয়েশা রাদি থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ

তিনি বলতেন: প্রত্যেক দুই রাকাতের পর বৈঠক রয়েছে। (সহীহ মুসলিম, ১১৩৮)

৬. উভয় বৈঠকে তাশাহুদ (আত্তাহিয়াতু) পড়া

হযরত ওমর রাদি. বলেন:

لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِتَشْهَرٍ

কোনো সালাত আদায় হবে না তাশাহুদ পাঠ করা ব্যতীত। (আস সুনানুল কতবুতা, ২৯৩৮)

প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত আতা রাহি. বলেন:

ফরয এবং নফল কোনো সালাত হবে না তাশাহুদ ছাড়া। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক, ৩০৭৯)

৭. জোরে এবং আস্তে পড়া

ইমামের জন্য যোহর, আছর এবং দিনের বেলার সুন্নাত ও নফল সালাতে আস্তে কিরাআত পড়া। আর মাগরিব ও ইশার সালাতের প্রথম দুই রাকআতে, ফজর, জুমুআ, দুই ঈদ, তারাযী ও রমযান মাসে বিতর সালাতে জোরে কিরাআত পড়া। একাকী সালাত আদায়কারী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে জোরেও পড়তে পারে আবার ইচ্ছা করলে আস্তেও পড়তে পারে। হাদীসে এসেছে -

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِحَبَّابٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي
الْظَهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَلِكَ قَالَ بِاضْطِرَابٍ لِحَيْتِهِ

আবু মায়মার রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা হযরত খাব্বাবকে রাদি. জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহর এবং আসরের সালাতে কিরাত পড়তেন নাকি? তিনি বললেন: হ্যাঁ। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কীভাবে জানলেন? তিনি বললেন: তাঁর দাঁড়ি নড়াচড়ার মাধ্যমে। (সহীহ বুখারী, ৭৪৬, ৭৬০, ৭৬১)

৮. সালামের মাধ্যমে সালাত শেষ করা :

দুই দিকে الله ورحمة الله عليكم বলে সালাত শেষ করা।

হযরত আলী রাদি. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে-

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

সালাতের চাবি হলো পবিত্রতা। তাহরিমা হলো তাকবীর বা আল্লাহু আকবার বলা। সালাত শেষ হবে সালামের দ্বারা। (সুনানু আবু দাউদ, হাদীস- ৬১, ৬১৮)

৯. দুআয়ে কুনূত পড়া

বিতরের সালাতের তৃতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়ার পর দুআয়ে কুনূত পড়া।

হযরত উবাই ইবনে কাব রাদি. বলেন-

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ فَيَقُتُّ قَبْلَ الرُّكُوعِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিতর পড়তেন। তিনি রুকুর আগে কুনূত পড়তেন। (ইবনে মাযাহ, ১১৮২)

সাহাবি হযরত আল-কামা রাদি, বলেন-

إِنَّ بَنَ مَسْعُودٍ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَقْتَتُونَ فِي الْوُتْرِ قَبْلَ
الركوع

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবিগণ বিতর সালাতে রুকুর আগে দুআয়ে কুনূত পড়তেন। (মুসান্নাফু ইবনে আবী শাইবা, ৬৯১১)

১০. সূরা ফাতিহাকে অন্য সূরার পূর্বে পড়া।

১১. দ্বিতীয় সাজদাকে প্রথম সাজদার পর বিলম্ব না করে আদায় করা।

১২. রুকু, সাজদাতে কমপক্ষে এক তাসবীহ পরিমাণ দেরি করা।

১৩. রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

১৪. দুই সাজদাহর মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

১৫. প্রথম বৈঠকের তাশাহুদ পড়ে বিলম্ব না করে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া।

১৬. দুই ঈদের সালাতে প্রত্যেক রাকআতে তিনটি করে মোট ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর বলা।

১৭. দুই ঈদের সালাতে দ্বিতীয় রাকআতে রুকুতে যাওয়ার সময় তাকবীর বলা।

১৮. প্রত্যেক রাকাতের ফরযগুলোর তারতীব ঠিক রাখা।

১৯. প্রত্যেক রাকাতের ওয়াজিবগুলোর তারতীব ঠিক রাখা।

নোট: আপনাদের অবগতির জন্য এখানে একটি সংশয়ের নিরসন করছি। আর তা হলো, আপনারা হয়তো কোনো কোনো কিতাবে সালাতের ওয়াজিব আরও কম-বেশি দেখেছেন বা দেখে থাকবেন। তখন স্বাভাবিক একটা সংশয় দেখা দিতে পারে যে,

কোথাও সালাতের ওয়াজিব কম উল্লেখিত হয়েছে। আবার কোথাও বেশি উল্লেখিত হয়েছে। এর কারণ কী? যারা বেশি উল্লেখ করেছেন, তারা কি হাদীসের নামে নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বানিয়ে বেশি ওয়াজিবের কথা উল্লেখ করেছেন? নাকি যারা ওয়াজিবগুলোকে কম উল্লেখ করেছেন, তারা হাদীস সম্পর্কে কম জানেন?

আমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করি তাহলে এই সংশয়ের নিরসন খুব সহজেই বুঝতে পারবো। এই সংশয়ের নিরসন হলো,

(ক) যারা কম ওয়াজিবের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা ওয়াজিবের কথাগুলোকে এমনভাবে উল্লেখ করেছেন, তাদের কম কথার মধ্যেই বেশি ওয়াজিবের কথা আলোচিত হয়েছে।

(খ) যারা বেশি ওয়াজিবের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা পাঠকের প্রতি লক্ষ্য করে আলোচনাকে একটু বিস্তারিত করতে গিয়ে ওয়াজিবের কথাগুলোকে ভাগভাগ করে আলোচনা করেছেন। ফলে তাদের হিসেবে ওয়াজিবের সংখ্যা বেশি হয়েছে।

(গ) কম-বেশি হওয়ার এটিও একটি কারণ যে, মুজতাহিদ ইমাম (হাদীসের উচ্চ স্তরের গবেষক) যারা ছিলেন তাদের নিজস্ব মূলনীতিতে কিছুটা তারতম্য থাকার কারণে এসব ক্ষেত্রে কিছুটা কম-বেশি হয়েছে।

সালাতের সুন্নাত সমূহের বিবরণ

সালাতের মধ্যে ৫১টি সুন্নাত রয়েছে।

যেমন-

দাঁড়ানোর মধ্যে ১১ টি

কিরাতাতের মধ্যে ৭ টি

রুকুর মধ্যে ৮ টি

সাজদার মধ্যে ১২ টি

বৈঠকের মধ্যে ১৩টি

মোট:৫১ টি

দাঁড়ানো অবস্থার সুন্নাত ১১টি

১. তাকবীরে তাহরীমার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো। অর্থাৎ মাথা না ঝুঁকানো।
২. পায়ের আঙ্গুলগুলোকে কিবলার দিকে রাখা। দুই পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা মুস্তাহাব।
৩. তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে পুরুষদের উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো। মহিলাদের উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত।
৪. মুজাদির তাকবীরে তাহরীমা ইমামের তাকবীরে তাহরীমার পরক্ষণেই হওয়া।
৫. তাকবীরে তাহরীমার সময় হাতের তালু কিবলার দিকে রাখা।
৬. হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখা।
৭. ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখা।
৮. ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও কনি আঙ্গুল দ্বারা বাম হাতের কজি পেঁচিয়ে ধরা।
৯. মধ্যের তিন আঙ্গুল বাম হাতের কজির উপর বিছিয়ে রাখা।
১০. নাভির নিচে হাত বাধা।
১১. ছানা পড়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীরে তাহরীমার পর সালাতের শুরুতে এই দুআ (ছানা) পড়তেন-

سبحانك اللهم و بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

হে আল্লাহ! আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনারই প্রশংসা । অনেক বরকতময় আপনার নাম। সুউচ্চ আপনার মর্যাদা। কোনো মাবুদ নেই আপনি ছাড়া। (আবু দাউদ, ৭৭৬)

কিরাআতের সুন্নাত ৭টি

১. তাআওউয়, অর্থাৎ **اعوذ بالله من الشيطان الرجيم** পড়া।
২. তাসমিয়া অর্থাৎ **بسم الله الرحمن الرحيم** পড়া।
৩. সূরা ফাতিহা পড়ার পর আস্তে আমীন বলা ।
৪. ফজর ও যোহরে তিওয়ালে মুফাসসাল পড়া, অর্থাৎ সূরা হুজরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত সূরা সমূহ থেকে পড়া । আসর ও ইশার সালাতে আওসাতে মুফাসসাল পড়া, অর্থাৎ সূরা তারিক থেকে সূরা বায়্যিনাহ পর্যন্ত সূরা সমূহ থেকে পড়া। মাগরীবের সালাতে কিসারে মুফাসসাল পড়া, অর্থাৎ সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরা সমূহ থেকে পড়া। তবে যোহরের সালাতে আওসাতে মুফাসসাল পড়ারও অনুমতি আছে।
৫. ফজরের প্রথম রাকাতকে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা লম্বা করা ।
৬. কিরাআত অতি ধীরে বা অতি দ্রুত গতিতে না পড়া ।
৭. ফরয সালাতের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকআতে সূরা ফাতিহা পড়া।

রুকু'র সুন্নাত ৮টি:

১. রুকুতে যাওয়ার সময় **الله اكبر** বলা।
২. রুকুতে উভয় হাত দ্বারা হাঁটুকে শক্ত করে ধরা।
৩. হাঁটু ধরতে হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পর ফাঁক রেখে ধরা ।
৪. পায়ের গোছা সোজা রাখা।
৫. উভয় হাত সম্পূর্ণ সোজা রাখা, কনুই বাকা না করা ।

৬. রুকু অবস্থায় মাথা, পিঠ ও কোমর বিছিয়ে এক বরাবর করে রাখা ।

৭. রুকুর মধ্যে কমপক্ষে তিনবার سبحان ربي العظيم পড়া ।

৮. রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমাম ربنا لك ربحا سمع الله لمن حمده বলবে। মুক্তাদি ربنا لك الحمد বলবে এবং একা সালাত আদায়কারী উভয়টি বলবে الحمد। বলার পর বলা মুস্তাহাব।
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

(সহীহ বুখারী, ৭৩৩)

সাজদার সুন্নাত ১২টিঃ

১. তাকবীর বলতে বলতে সাজদাতে যাওয়া ।

২. সাজদাতে যাওয়ার সময় জমিনের উপর প্রথমে দুই হাঁটু রাখা ।

৩. অতঃপর উভয় হাত রাখা ।

৪. অতঃপর নাক বৃদ্ধাঙ্গুল বরাবর রাখা ।

৫. অতঃপর কপাল রাখা ।

৬. দুই হাতের মাঝখানে সাজদা করা ।

৭. সাজদা অবস্থায় রান থেকে পেট পৃথক রাখা ।

৮. বাজুকে বগল থেকে পৃথক রাখা ।

৯. উভয় হাত কজি থেকে কনুই পর্যন্ত জমিনের উপর বিছিয়ে রাখা ।

১০. সাজদার মধ্যে কমপক্ষে তিনবার سبحان ربي الاعلى পড়া ।

১১. সাজদা থেকে মাথা উঠানোর সময় তাকবীর বলা ।

১২. সাজদা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর উভয় হাত, তারপর হাঁটু উঠানো এবং দুই সাজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা ।

বসার সুন্নাত ১৩টি:

১. বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা, ডান পা খাড়া রাখা এবং পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলার দিকে রাখা।
২. উভয় হাত রানের উপর রাখা। আঙ্গুলের মাথা হাঁটু বরাবর রাখা।
৩. আত্তাহিয়াতু-এর মধ্যে আশহাদু আল্লা বলার সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকৃতি বানিয়ে শাহাদাত আঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করা এবং ইল্লাল্লাহ বলার সময় আঙ্গুল ঝুকিয়ে দেয়া, ইশারা শেষ করে গোলাকৃতি সালাতের শেষ পর্যন্ত বাকি রাখা।
৪. শেষ বৈঠকে দুরুদ পড়া।
৫. দুরুদের পর দুআয়ে মাছুরা পড়া।
৬. দুই দিকে সালাম ফিরানো।
৭. প্রথমে ডান দিকে সালাম ফিরানো।
৮. সালামের সময় ইমামের জন্য মুক্তাদী, ফিরিশতা এবং নেক জীন্নাতের নিয়ত করা।
৯. সালামের সময় মুক্তাদীদের জন্য ইমাম, ফিরিশতা ও নেক জীন্নাতে এবং ডান ও বামের মুক্তাদীদের নিয়ত করা।
১০. একা সালাত আদায়কারীদের জন্য কেবল ফিরিশতাদের নিয়ত করা।
১১. মুক্তাদীগণও ইমামের সাথেই সালাম ফিরানো।
১২. প্রথম সালামের আওয়াজ দ্বিতীয় সালামের আওয়াজ অপেক্ষা উচ্চ করা।
১৩. মাসবুক ব্যক্তির অবশিষ্ট সালাত আদায় করার জন্য ইমামের উভয় দিকে সালাম ফিরানোর শেষ করার অপেক্ষা করা।

নোট:সংশয়ের নিরসন। আর তা হলো, আমরা হয়তো কোনো কোনো কিতাবে সালাতের সুন্নত আরও কম-বেশি দেখেছি বা দেখে থাকবো। তখন স্বাভাবিক একটা সংশয় দেখা

দিতে পারে যে, কোথাও সালাতের সুন্নত কম উল্লেখিত হয়েছে। আবার কোথাও বেশি উল্লেখিত হয়েছে। এর কারণ কী?

(ক) যারা কম সুন্নতের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা সুন্নতের কথাগুলোকে এমনভাবে উল্লেখ করেছেন, তাদের কম কথার মধ্যেই বেশি সুন্নতের কথা আলোচিত হয়েছে। যে কম কথাকে একটু ব্যাখ্যা করলে আরও কিছু সুন্নতের কথা পাওয়া যাবে।

(খ) যারা বেশি সুন্নতের কথা উল্লেখ করেছেন, তারা পাঠকের প্রতি লক্ষ্য করে আলোচনাকে একটু বিস্তারিত করতে গিয়ে সুন্নতের কথাগুলোকে ভাগভাগ করে আলোচনা করেছেন। ফলে তাদের হিসেবে সুন্নতের সংখ্যা বেশি হয়েছে।

(গ) কম-বেশি হওয়ার এটিও একটি কারণ যে, মুজতাহিদ ইমাম (হাদীসের উচ্চ স্তরের গবেষক) যারা ছিলেন তাদের নিজস্ব মূলনীতিতে কিছুটা তারতম্য থাকার কারণে এসব ক্ষেত্রে কিছুটা কম-বেশি হয়েছে।

(ঘ) এসব ক্ষেত্রে কোনো লিখক বা গবেষক কোনো মুস্তাহাব বা নফল আমলকে সুন্নত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এমনটা করা দুঃখনীয়ও নয়।

পুরুষ ও মহিলাদের সালাতের পার্থক্য

পুরুষ এবং মহিলাদের সালাতের মধ্যে মৌলিক তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তবে পাঁচটি স্থানে পুরুষ এবং মহিলাদের সালাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সেই পার্থক্যের কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে পুরুষ এবং মহিলাদের সালাতের মধ্যে আরও কিছু পার্থক্য হওয়ার দাবী রাখে। প্রথমে পাঁচটি পার্থক্য উল্লেখ করব। তারপর সেই পার্থক্যকে কেন্দ্র করে সালাতের অন্যান্য আলোচনা করব।

১. হাত উঠানোর ক্ষেত্রে পার্থক্য :

হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, পুরুষের মতো কান পর্যন্ত উঠাবে না। মহিলারা তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। (কান পর্যন্ত উঠাবে না।)

হযরত আতা রাহি. বলেন:

لَا تَرْفَعُ يَدَيْهَا كَالرَّجُلِ

‘মহিলারা পুরুষের মতো হাত উঠাবে না ।’ (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, ৪৮৮৯)

মহিলারা পুরুষের মতো হাত উঠাবে না। তাহলে কীভাবে হাত উঠাবে? এই জবাব রয়েছে অন্য হাদীসের মধ্যে।

হাদীসে এসেছে-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ جِذَاءً وَأُذُنَيْكَ جِذَاءً وَتَجْعَلْ يَدَيْهَا جِذَاءً نَدَّيْنِهَا

‘ওয়ায়েল ইবনে হুজর রাদি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন: হে হুজর! যখন তুমি সালাত পড়বে তখন তোমার হাতকে কান বরাবর উঠাবে। আর মহিলা তার হাতকে কাঁধ বরাবর উঠাবে। (আল-মুয়জামুল কাবীর, ২৮)

প্রখ্যাত তাবেরী ইমাম যুহরী রাহি. বলেন:

تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا

‘মহিলা তার হাতকে কাঁধ বরাবর উঠাবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস-২৪৭২)

২. সাজদার ক্ষেত্রে পার্থক্য:

সাজদার সময় মহিলারা হাতকে জমিনের সাথে এবং পেটকে উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা সাজদার ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের মতো নয়। সাজদার ক্ষেত্রে মহিলারা হাতকে জমিনে সাথে মিলিয়ে রাখবে:

হাদীসে এসেছে-

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ: إِذَا سَجَدْتُمَا فَضْمَا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي

ذَلِكَ كَالرَّجُلِ

হযরত ইয়াযিদ ইবনে হাবিব রাদি. বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি তাদেরকে বললেন: যখন তোমরা সাজদা করবে তখন হাতকে জমিনের সাথে মিলিয়ে রাখবে। কেননা সাজদার ক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষের মতো নয়। (আস-সুনানুল কতবুওয়া, ৩৩২৫)

সাজদার মধ্যে মহিলারা পেটকে উরুর সাথে মিলিয়ে রাখবে: হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَإِذَا سَجَدْتَ أَلَصَقْتَ بَطْنَهَا فِي فَخْذِهَا كَأَسْتَرٍ مَا يَكُونُ لَهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: . যখন মহিলারা সাজদা করবে তখন পেটকে উরুর সাথে একেবারে মিলিয়ে রাখবে। এটা তার সতরের জন্য বেশি উপযুক্ত। মহান আল্লাহ তাকে দেখেন এবং ফিরিশতাদেরকে বলেন: হে আমার ফিরিশতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।’ (আস-সুনানুল কতবুওয়া, হাদীস-৩৩২৪)

৩. বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য

বৈঠকের মধ্যে মহিলারা ডান উরুকে বাম উরুর উপর রাখবে। হাদীসে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَتْ فَخْذَهَا عَلَى فَخْذِهَا الْأُخْرَى كَأَسْتَرٍ مَا يَكُونُ لَهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهَا

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: মহিলারা যখন সালাতের মধ্যে বসবে তখন তার (ডান) উরুকে অপর উরুর উপর রাখবে। এটা তার সতরের জন্য বেশি উপযুক্ত। মহান আল্লাহ তাকে দেখেন এবং ফিরিশতাদেরকে বলেন: হে আমার ফিরিশতারা! তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম।’ (আস-সুনানুল কতবুওয়া, ৩৩২৪)

৪. জড়োসড় হয়ে থাকার ক্ষেত্রে:

উপরে উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, পুরুষ ও মহিলাদের সালাত আদায়ের পদ্ধতি এক ধরনের নয়। এ কথাও বুঝা গেছে যে, মহিলারা সালাতের মধ্যে সাধারণত সতরকে যথাসম্ভব বেশি করে রক্ষা করতে হবে। এজন্য মহিলাদের উচিত হচ্ছে জড়সড় হয়ে এবং একটি অঙ্গকে আরেকটি অঙ্গের সাথে মিলিয়ে রাখা। হযরত ইবনে আব্বাস রাদি. এর উক্তি থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ ۖ فَقَالَ: تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ

‘হযরত ইবনে আব্বাস রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহুকে মহিলাদের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি বললেন; মহিলারা জড়সড় হয়ে এবং অঙ্গগুলোকে একটির সাথে আরেকটিকে মিলিয়ে রাখবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, হাদীস- ২৭৯৪)

৫. সতরের ক্ষেত্রে পার্থক্য:

পূর্বে এই বিষয়ে বিস্তারিত গিয়েছে।

↓

(সালাত শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহে)

এতোক্ষণ পুরুষ এবং মহিলাদের সালাতের উল্লেখযোগ্য এবং মৌলিক পাঁচটি পার্থক্যের কথা হাদীস ভিত্তিক আলোচনা করেছি। সেই পাঁচটি পার্থক্য হচ্ছে-

১. হাত উঠানোর ক্ষেত্রে পার্থক্য:

২. সাজদার ক্ষেত্রে পার্থক্য:

৩. বৈঠকের মধ্যে পার্থক্য:

৪. জড়োসড় হয়ে থাকার ক্ষেত্রে:

৫. সতরের ক্ষেত্রে পার্থক্য:

উল্লেখিত পাঁচটি পার্থক্যের ভিত্তিতে আরও যেসব ক্ষেত্রে পার্থক্য হওয়ার

দাবী রাখে তা হচ্ছে-

৬. বুকুর উপর হাত বাধবে, নাভির নীচে হাত বাঁধবে না:

৭. হাত চাদর বা ওড়না ইত্যাদির ভেতর থেকে বের করবে না ।

৮. মহিলারা শুধু ডান হাতের পাতা বাম হাতের পিঠের উপর রাখবে। পুরুষের ন্যায় কজি ধরবে না এবং গোলাকৃতিও বানাবে না।

৯. রুকুর মধ্যে সামান্য ঝুকবে।

১০. রুকুর মধ্যে উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে হাটুর উপর রাখবে।

১১. রুকু অবস্থায় কনুই পাঁজরের সঙ্গে চাপিয়ে রাখবে।

১২. রুকুর মধ্যে উভয় পা একেবারে সোজা করে রাখবে না বরং হাঁটুকে সামনের দিকে কিছুটা বাকা করে দাঁড়াবে।

১৩. সাজদার মধ্যে হাত-পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে রাখবে, কিন্তু পা খাড়া করবে না । বরং ডান দিকে বের করে দেবে ।

১৪. বসার সময় বাম দিকে নিতম্বের উপর ভর করে বসবে।

১৫. উভয় পা ডান দিকে বের করে রাখবে।

১৬. আত্তাহিয়্যাতু এবং দুই সাজদার মাঝের বৈঠকের সময় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে।

(আমার সালাত)

মহিলাদের সালাতের ৯৯টি মাসায়েল

মাসায়িলে কিয়াম ২৭টি।

দাঁড়ানোতে ৭ কাজ

- ১.পায়ের আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে সোজাভাবে রাখা।
- ২.উভয় পায়ের মাঝখানে অনূর্ধ্ব চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রাখা।
- ৩.উভয় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয় ও গোঁড়ালিদ্বয়ের মাঝে সমান দূরত্ব রাখা।
- ৪.তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে হাত ছেড়ে দাঁড়ানো। (হাত বেঁধে না রাখা)।
- ৫.সম্পূর্ণ সোজা হওয়া (এক পায়ে ভর দিয়ে বাঁকা হয়ে না দাঁড়ানো)।
- ৬.ঘাড় সোজা রাখা। চেহারা জমিনের দিকে না করা। ৭.সিজদার জায়গার দিকে নজর রাখা।

[বি.দ্র. ফরয নামাযের কিয়াম (দাঁড়িয়ে নামায পড়া পুরুষ-মহিলা সকলের জন্যই ফরয।]

হাত উঠানোতে ৮ কাজ।

- ১.হাত কাপড়ের ভিতর রেখে উঠানো। (বাইরে বের না করা) হাত উঠানোর সময় জমিনের দিকে মাথা না ঝুঁকানো।
 - ২.হাত উঠানোর সময় (যথাসম্ভব) হাত শরীরের সাথে লাগিয়ে রাখা।
 - ৩.তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো।
 - ৪.হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।
 - ৫.হাতের তালু সম্পূর্ণ কিবলামুখী করে রাখা।
 - ৬.তাকবীরে তাহরীমা বলার প্রাক্কালে উক্ত নামাযের খেয়াল (নিয়ত) মনে হাজির করা।
- [ফরয]

৭.হাত উঠানোর পর তাকবীরে তাহরীমা শুরু করা। (তাকবীর-এর মাদ এক আলিফ থেকে বেশী না টানা।)

৮.তাকবীরে তাহরীমা বলার পর সরাসরি বুকের উপর হাত রাখা। (হাত বাঁধার আগে হাত ঝুলিয়ে না দেয়া)।

হাত বাঁধায় ৪ কাজ।

১.ডান হাতের তালু বাম হাতের পিঠের উপর রাখা।

২.সিনার উপর হাত রাখা।

৩.হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখা।

৪.উভয় বাজু বগলের সাথে মিলিয়ে রাখা।

হাত বাঁধার পর ৮ কাজ।

১.ছানা পড়া

২.আ'উযুবিল্লাহ পড়া।

৩.বিসমিল্লাহ পড়া।

৪.সূরা ফাতিহা পড়া [ওয়াজিব]।

৫.সূরা ফাতিহা পড়ার পর নীরবে আমীন বলা।

৬.সূরা মিলানো (ফজরের প্রথম দু'রাকা'আতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফলের সব ক'টি রাকা'আতে) [ওয়াজিব]।

৭.সূরা এর শুরু থেকে মিলালে প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়া।

৮. মাসনুন কিরা'আত পড়া।

[বি.দ্র.পরবর্তী রাকা'আতগুলোতে তাকবীরে তাহরীমার মত হাত

উঠানো,ছানা,আউ'যুবিল্লাহ নেই।]

মাসায়িলে রুকু ১৩টি।

রুকু অবস্থায় ১০ কাজ।

১.রুকু‘তে যাওয়া অবস্থায় তাকবীর বলা।

২.উভয় পায়ের গোড়ালীদ্বয় মিলিয়ে রাখা।

৩.রুকুতে পূর্ণ বাঁকা না হয়ে মধ্যম ধরনের ঝুঁকা।

৪.চাদরের ভিতর দিয়ে হাতের আগুল হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া।

৫.হাতের আগুলগুলো মিলিয়ে রাখা।

৬.হাঁটুদ্বয় একটু বাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখা। ৭.সম্পূর্ণ হাত শরীরের সাথে মিলিয়ে রাখা।

৮.পায়ের দিকে নজর রাখা।

৯.রুকু‘তে কমপক্ষে তিনবার রুকু‘র তাসবীহ্ (সুবহানা রাব্বিয়াল ‘আযীম) পড়া।

১০.রুকু করা ফরয এবং রুকুতে কমপক্ষে এক তাসবীহ্ পরিমাণ দেবী করা ওয়াজিব।

রুকু থেকে উঠায় ৩ কাজ।

১.রুকু থেকে উঠার সময় ‘সামি‘আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ্’ বলা।

২.সোজা হয়ে (হাত ছেড়ে) স্থিরভাবে দাঁড়ানো। ওয়াজিব।

৩.দাঁড়িয়ে ‘রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ’ বলা।

মাসায়িলে সিজদা ৩৪টি:

সিজদা অবস্থায় ১৯ কাজ।

১ সিজদায় যাওয়া অবস্থায় তাকবীর বলা।

২.হাঁটু মাটিতে লাগার আগ পর্যন্ত সিনা ও মাথা সোজা রাখা অবস্থায় সিজদায় যাওয়া।

৩.(প্রথমে) উভয় হাঁটু মাটিতে রাখা।

৪.(তারপর) নিতম্ব রাখা

৫.উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে বিছিয়ে রাখা। ৬.পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখী করে রাখা। ৭.তারপর আঙ্গুল মিলিয়ে হাঁটুর কাছে মাথা রাখা। ৮.আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী করে সোজাভাবে

রাখা।

৯.দু'হাতের মধ্যখানে চেহারা রাখা যায় এ পরিমাণ ফাঁক রাখা।

১০.(তারপর) বৃদ্ধাঙ্গুলের মাথা বরাবর হাঁটুর সামনে রাখা।

১১.নাকের অগ্রভাগের দিকে অর্থাৎ জমিনের দিকে নজর রাখা।

১২.(তারপর) কপাল রাখা।

১১.পেট উরু থেকে পৃথক রাখা।

১২.কনুই মাটি ও রান থেকে পৃথক রাখা।

১৩.পেট উরুর সঙ্গে মিলিয়ে রাখা।

১৪.কনুই মাটিতে লাগিয়ে রাখা।

১৫.বাহু শরীরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখা।

১৬.অত্যন্ত জড়সড় হয়ে সিজদা করা।

১৭ আঙ্গুলসমূহ পরস্পরে মিলিয়ে রাখা।

১৮.কমপক্ষে তিনবার সিজদার তাসবীহ্ (সুবহানা রাব্বিয়াল আলা) পড়া।

১৯.সিজদা করা ফরয এবং সিজদায় কমপক্ষে এক

তাসবীহ্ পরিমাণ দেবী করা ওয়াজিব।

সিজদা থেকে উঠার সময় ১৫ কাজ:

১.সিজদা থেকে উঠা অবস্থায় তাকবীর বলা।

২.(প্রথমে) কপাল উঠানো।

৩.(তারপর) নাক উঠানো।

৪.(তারপর) উভয় হাত উঠানো।

৫.দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে স্থিরভাবে বসা। [ওয়াজিব]।

৬.উভয় পা ডান দিক দিয়ে বের করে বিছিয়ে রাখা। ৭.উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ (সম্ভবমত) কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।

৮.নিতম্বের উপর বসা।

৯.উভয় হাত উরুর উপর হাতের আঙ্গুলের মাথা হাঁটু বরাবর রাখা।

১০.নজর দুই হাঁটুর মাঝে রাখা।

১১.বসা অবস্থায় দু'আ (আল্লাহুম্মাগফিরলী) বলা।

১২.তাকবীর বলা অবস্থায় দ্বিতীয় সিজদায় যাওয়া। ১৩.পূর্বের নিয়মে দ্বিতীয় সিজদার পর তাকবীর বলা অবস্থায় পরবর্তী রাক'আতের জন্য পায়ের অগ্রভাগে ভর করে দাঁড়ানো।

১৪.হাঁটুর উপর হাত রেখে দাঁড়ানো।

১৫.সিজদা হতে সরাসরি দাঁড়ানো। (মাঝখানে না বসা) এবং উঠার মাঝে রুকুর অবস্থা সৃষ্টি না করা।

মাসায়িল কুউদ (বৈঠক) ১৯টি

বসায় ১২ কাজ

- ১.উভয় পা ডান দিকে বের করে বিছিয়ে বসা। ২.উভয় পায়ের আঙ্গুলসমূহ (সম্ভবমত) কিবলার দিকে মুড়িয়ে রাখা।
- ৩.উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখা এবং উরুর উপর আঙ্গুলসমূহের মাথা হাঁটু বরাবর রাখা।
- ৪.মাথা ও পিঠ সোজা রাখা।
- ৫.নজর দুই হাঁটুর মাঝে রাখা।
- ৬.‘আত্তাহিয়াতু’ পড়া। [ওয়াজিব]
- ৭.‘আশহাদু’ বলার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথা একসঙ্গে মিলিয়ে এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলদ্বয় মুড়িয়ে রেখে হালকা বাঁধা।
- ৮.‘লা ইলাহা’ বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল সামান্য উঁচু করে ইশারা করা। অতঃপর ‘ইল্লাল্লাহু’ বলার সময় নামানো।
- ৯.বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত ঐরূপ হালকা বাঁধা অবস্থায় রাখা।
- ১০.আখেরী বৈঠক (আত্তাহিয়াতুর পর) দরুদ শরীফ পড়া।
- ১২.(অতঃপর) দু‘আয়ে মাসূরা পড়া। [বি.দ্র. ১ম বৈঠক ওয়াজিব ও শেষ বৈঠক ফরজ।]

সালাম ফিরানোর ৭ কাজ

- ১.একা নামায পড়লে উভয় সালামের সময় ফেরেশতাদেরকে সালাম করার নিয়ত করা এবং জামা‘আতের সময় উভয় সালামে ইমাম, অন্যান্য মুসল্লী, ফেরেশতা ও নামাযী জ্বিনদের সালাম করার নিয়ত করা।
- ২.উভয় সালাম কিবলার দিক থেকে শুরু করা।

- ৩.উভয় সালামে ‘আসসালামু’ বলা পর্যন্ত চেহারা কেবলার দিকে রাখা।
- ৪.প্রথমে ডান দিকে, অতঃপর বাম দিকে সালাম ফিরানো।
- ৫.সালামের সময় ডানে-বামে শুধু চেহারা ফিরানো (সিনা না ফিরানো)।
- ৬.আলাইকুম বলার সময় নজর কাঁধের দিকে ফিরানো।
- ৭.দ্বিতীয় সালাম, প্রথম সালামের তুলনায় আস্তে বলা।

পুরো নামাযের ৮ মাসায়িল

- ১.নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অন্তরে নামাযের খেয়াল রাখা, আর সহজ পদ্ধতি হল সব কিছু খেয়াল রাখা, আর সহজ পদ্ধতি হল সব কিছু খেয়াল করে পড়া। মুখস্তের জোরে না পড়া। (মন অন্য কোন দিকে চলে গেলে, স্মরণ হওয়া মাত্রই ফিরিয়ে আনা
- ২.মাঝের তাকবীরগুলো পূর্ববর্তী রুকন থেকে আরম্ভ করে অপর রুকনে পৌঁছে শেষ করা। (কিন্তু তাকবীর এক আলিফ থেকে টানা যাবে না।)
- ৩.এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যেতে বিনা ওযরে বিলম্ব না করা।
- ৪.পঠিত সূরা বা দু‘আ সমূহের প্রতি অন্তরে খেয়াল করা।
- ৫.ক্বিরা‘আত,তাকবীর,দু‘আ ইত্যাদি চুপি চুপি পড়া। ৬.সর্বাবস্থায় হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখা। ৭.হাই আসলে, যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখতে চেষ্টা করা। ৮.হাঁচি আসলে সাধ্যমত দমিয়ে রাখা।
- এ পর্যন্ত ‘মহিলাদের নামাযের ৯৯ মাসায়িল’ পূর্ণ হল।

জরুরী জ্ঞাতব্য:

মাসায়িলে উল্লিখিত কাজগুলোর মধ্য হতে যেগুলোর শেষে ফরয বা ওয়াজিব লেখা আছে, সেগুলো ফরয বা ওয়াজিব। অবশিষ্ট কাজগুলো সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব।

(নামায শিক্ষা ও ইমামগনের জিন্মাদারী)

সালাত ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ

যে সব কাজের দ্বারা সালাত ভেঙে যায়:

সালাতের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর কোনো একটি পাওয়া গেলে সালাত ভেঙে যাবে ।

১. সালাতের শর্তসমূহের কোন একটি ছুটে গেলে ।
২. সালাতের ফরযসমূহের কোন একটি ছেড়ে গেলে ।
৩. ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলে হোক, সালাতে কথা বললে ।
৪. মানুষের কথার ন্যায় কোনো দুআ করলে ।
৫. কাউকে সালাম দিলে অথবা মুখ বা মুসাফাহা দ্বারা সালামের উত্তর দিলে । ইচ্ছা করে হোক বা ভুলে ।
৬. অধিক বা বড় কাজ করলে । অধিক বা বড় কাজ বলতে ঐ কাজকে বুঝানো হয়, যা দেখে দর্শকের মনে হয় যে লোকটি সালাতের মধ্যে নেই ।
৭. বুক কিবলার দিক থেকে পরিবর্তন করলে । তবে সালাতে ওয়ূ নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যদি কেউ ওয়ূ করার জন্য বের হয় আর তার বুক কিবলার দিক থেকে পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে তার সালাত ভেঙে যাবে না ।
৮. সালাতের মধ্যে কোনো কিছু খেলে বা পান করলে । যদি তা সামান্য হয় । তবে যদি তা ছোলা থেকে ছোট হয়, তাহলে সালাত নষ্ট হবে না ।
৯. দাঁতে লেগে থাকা ছোলা পরিমাণ বা তার থেকে বড় বস্তু খেলে ।

১০. কোনো প্রয়োজন ছাড়া গলা ঝাড়লে বা কাশাকাশি করলে। তবে প্রয়োজন বশত বা কষ্ট স্পষ্ট হওয়ার জন্য কিংবা ইমামকে সতর্ক করার জন্য গলা ঝাড়লে সালাত নষ্ট হবে না।

১১. যদি উহ বা উফ অথবা সালাতে কান্না করে তাহলে সালাত ভেঙে যাবে। তবে আল্লাহর ভয়ে এমন হলে সালাত নষ্ট হবে না। যদি অসুস্থতার কারণে অনিচ্ছায় হয় তাহলেও সালাত নষ্ট হবে না। জান্নাত ও জাহান্নামের স্মরণে যদি কান্না আসে তাহলেও সালাত নষ্ট হবে না। বিপদের কারণে কান্না করে তাহলে সালাত ভেঙে যাবে।

১২. সালাতের মধ্যে সতর খুলে গিয়ে তা এক রুকন বা তিন তাসবিহ পরিমাণ সময় বিলম্ব হলে।

১৩. সালাতের মধ্যে পাগলামী চলে এলে।

১৪. সালাতের মধ্যে অজ্ঞান হলে।

১৫. ঈদের সালাতে সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়লে।

১৬. জুমুআর সালাত আদায় করতে গিয়ে তা আসরের সালাতের সময়ে প্রবেশ করলে।

১৭. তায়াম্মুম করে সালাত শুরু করার পর পানি পাওয়া গেলে এবং তা ব্যবহারে সক্ষম হলে।

১৮. কোনো কারণে ওয়ূ নষ্ট হয়ে গেলে।

১৯. তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় আল্লাহ্ আকবার শব্দের শুরুতে অ্যা বা হামজাকে লম্বা করে পড়লে। কারণ তখন এর অর্থ হয় আল্লাহ কি বড়?। যা প্রশ্নবোধক শব্দ। এমন শব্দ দিয়ে সালাত শুরু করলে সালাত ভেঙে যাবে।

২০. সালাতের মধ্যে কুরআন দেখে দেখে পড়লে।

২১. ইমাম সাহেবের ওয়ূ নষ্ট হওয়ার পর তিনি যদি এমন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি বানায়, যে ব্যক্তি ইমামতির একবারে অযোগ্য।

২২. সালাতের মধ্যে উচ্চ আওয়াজে হাসলে।

২৩. জামাতে সালাত আদায় করার সময় মুক্তাদী যদি কোনো রুকুনকে ইমামের আগে আদায় করে নেয় এবং তা আদায়ে ইমামের সাথে অংশীদার না হয়। যেমন, মুক্তাদী ইমামের পূর্বে রুকুতে গেল এবং ইমাম রুকুতে না যাওয়ার আগে সে রুকু থেকে উঠে গেল এবং পুনরায় ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হয় নি। এমন হলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

যে সব কাজের দ্বারা সালাত নষ্ট হয় না

সালাতের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর কোনো একটি পাওয়া গেলেও সালাত ভেঙে যাবে না:

১. সালাত শেষ করার জন্য ভুলে সালাম ফেরালে।
২. কেউ সালাত আদায়কারীর সাজদার স্থান দিয়ে হেটে গেলে।
৩. দাঁতে লেগে থাকা ছেলার চেয়ে ছোট বস্তু খেয়ে ফেললে।
৪. কোন লেখার দিকে তাকালে এবং তা বুঝে ফেললে।
৫. সালাতের মধ্যে মুচকি হাসি এলে। তবে এর কারণে সালাতের সওয়াব নষ্ট হয়ে যাবে।

সালাতের উল্লেখযোগ্য কিছু মাকরুহ

- সালাতরত অবস্থায় কাপড় বা শরীর নিয়ে খেলা করা মাকরুহ, যদি তা আমলে কাসীর না হয় আর আমলে কাসীর হলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।
- সিজদার স্থান থেকে কংকর বা পাথরকণা সরানো (মাকরুহ) অবশ্য সিজদা করা অসম্ভব হলে এক-দুইবার কংকর সরানোর অবকাশ আছে।
- আঙ্গুল সমূহকে মলা বা টেনে ফুটানো।

- বস্ত্র, শরীর অথবা দাঁড়ির সাথে খেলা করা।
- কোমরে হাত রাখা মাকরুহ।
- ডানে-বামে মুখ ফিরানোর দ্বারা যদি সিনা কেবলার দিক থেকে ফিরে যায় তাহলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সিনা কেবলা দিক থেকে না ফিরে, তাহলে সালাত নষ্ট হবে না; অবশ্য সালাত মাকরুহ হবে।
- ওজর ছাড়াই উভয় হাটু খাড়া করে হাত মাটিতে রেখে নিতম্ব ও পায়ের ওপর কুকুরের ন্যায় বসা।
- সিজদায় উভয় বাহুকে মাটিতে বিছিয়ে দেয়া।
- হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া।
- ফরয সালাতে বিনা ওজরে আসন করে বসা।
- মাটি লেগে যাওয়ার ভয়ে কাপড় হেফায়ত করা।
- সদলে ছাওব করা অর্থাৎ কাপড় কাঁধে রেখে তার উভয় প্রান্ত একত্র না করে ঝুলিয়ে দেয়া।
- হাই তোলা। হাই ও হাঁচি যথাসম্ভব প্রতিহত করবে। না পারলে সমস্যা নেই।
- শরীরের অলসতা দূর করার জন্য মোচড়ানো।
- চোখ বন্ধ রাখা। অথচ দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখা উচিত।
- চুল মাথার ওপর ভাজ করে গিরা দিয়ে সালাত পড়া। মাথায় চুল থাকলে সালাতের মধ্যে তা ছেড়ে রাখা সুন্নাত যাতে চুলও সিজদা করতে পারে।
- খোলা মাথায় সালাত পড়া মাকরুহ। তবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের নিমিত্তে এরূপ করলে মাকরুহ হবে না।
- শুধু ইমাম সাহেব মসজিদের মেহরাবে এবং সমস্ত লোক মেহরাবের বাইরে দাঁড়ানো।
- ইমাম সাহেব একা উঁচু স্থানে এবং সমস্ত লোক নিচে দাঁড়ানো।

→কাতারে দাঁড়ানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পিছনে একা দাঁড়ানো। তবে যদি সুযোগ না থাকে তাহলে (সামনের কাতার থেকে মাসআলা জানে এমন একজনকে টেনে এনে নিজের সাথে দাড় করাবে। তার পরও চেষ্টা করবেন একা শুধু কাতারে না দাঁড়াতে।

→মানুষ অথবা জন্তুর ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা।

সামনে, বামে অথবা ডানে ছবি থাকাবস্থায় সালাত →মাকরুহ। তবে যদি ছবি পায়ের নিচে কিংবা পিছনে থাকে, তাহলে কোন ক্ষতি নেই।

→ সালাতের কোন সুন্নাত পরিত্যাগ করা।

(ফিকহের প্রায় সব কিতাবাদি দ্রষ্টব্য)

সিজদায়ে সাহুর আহকাম

সিজদায়ে সাহুর পরিচয় এবং তার হুকুম

পরিভাষায়: সালাতের মধ্যে ভুল ক্রমে কোনো ওয়াজিব বাদ পড়ে গেলে, কোনো ওয়াজিব কাজ একাধিকবার করলে অথবা ধারাবাহিকতার পরিপন্থি করলে; সালাত বিশুদ্ধ করার নিমিত্তে শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দুটি সেজদা করা 'সাজদায়ে সাহু' বলে।

অর্থাৎ সালাতে যেকোনো ভুলের কারণে সিজদা সাহু ওয়াজিব হয়ে যায় না। বরং ভুলে সালাতের কোনো ওয়াজিব ছুটে গেলে কিংবা কোনো ফরয বা ওয়াজিব বিলম্বিত হলে ওয়াজিব হয়। আর যদি ভুলে কোনো ফরয ছুটে যায়, তবে সিজদা সাহু করা যথেষ্ট নয়, বরং পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। আর কোনো সুন্নাত বা মুস্তাহাব ছুটে গেলে সিজদা সাহু করার বিধান নেই।

হুকুম ফিকহে হানাফী অনুযায়ী 'সাজদাহে সাহু'র হুকুম হলো ওয়াজিব।

যে ব্যক্তি সালাতের মধ্যে কোনো রুকন বা ফরয ছেড়ে দিবে, তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় সেই সালাত পড়ে নেয়া ওয়াজিব। এমনভাবে যে ব্যক্তির সালাতের মধ্যে কোনো রুকন বা ফরয ভুলে ছুটে যায়, তার সালাতও বাতিল হয়ে যাবে। এই সালাতও পুনরায় পড়ে নেয়া ওয়াজিব। সালাতের মধ্যে কোন রুকন বা ফরয নষ্ট হলে, চাই ইচ্ছা করে হোক বা ভুলে হোক, তা সাজদায়ে সাহু দ্বারা পূরণ হবে না।

আর যে ব্যক্তি সালাতের মধ্যে কোন ওয়াজিব আমলকে ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দিবে, সে গুনাহগার হবে। তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। সালাতের যে ক্ষতি হয়েছে তা সাজদায়ে সাহু দ্বারা পূরণ হবে না। সুতরাং এই সালাত পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

আর যে ব্যক্তি সালাতের কোন ওয়াজিব আমলকে ভুলবশতঃ ছেড়ে দিবে, তার জন্য সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব। ভুলবশত ওয়াজিব ছুটে যাবার কারণে সালাতের যে ক্ষতি হয়েছে, তা সাজদায়ে সাহু দ্বারা পূরণ হয়ে

যাবে।

যে সব আমলকে ভুলে ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু করতে হয় এবং সাজদায়ে সাহু দ্বারা সে ভুলের ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়।

১। ফরয সালাতের প্রথম দুই রাকাতের কোন এক রাকআতে বা উভয় রাকআতে সূরায়ে ফাতিহা পড়া ভুলে ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

২। নফল ও বিতর সালাতের যে কোন রাকআতে সূরা ফাতিহা ভুলে ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

৩। ফরয সালাতের প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পড়া ভুলে গিয়ে শেষের দুই রাকআতে পড়লেও সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

৪। ফরয সালাতের প্রথম দুই রাকাতের কোন এক রাকআতে অথবা উভয় রাকআতে সূরায়ে ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়া ভুলে গেলে সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

৫। নফল ও বিতর সালাতের যে কোন রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়া ভুলে ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

৬। একই রাকআতে সূরা ফাতিহা দুইবার পড়লে সাহু সাজদা দেয়া ওয়াজিব। কারণ সে যথা সময়ে অন্য সূরা বা ফরয আমলকে দেরী করে সম্পন্ন করেছে।

৭। তিন বা চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয, ওয়াজিব এবং নফল সালাতের প্রথম বৈঠক ভুলবশত: ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব।

৮। ভুলবশত: তাশাহুদ (আত্তাহিয়াতু...) ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

৯। বিতর সালাতের মধ্যে কুনূতের তাকবীর ছেড়ে দিলে সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

১০। রুকুতে যাবার পূর্বে বিতর সালাতে ভুলবশত: কুনূত না পড়লে।

১১। যে সব সালাতে নীচু আওয়াজে তিলাওয়াত করা হয়, সে সব সালাতে উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করলেও সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

১২। যে সব সালাতে উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করা হয়, সে সব সালাতে নীচু আওয়াজে তিলাওয়াত করলেও সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

১৩। প্রথম বৈঠকে ভুলবশত: তাশাহুদ পাঠ করার পর এমন কিছু পাঠ করল বা এই পরিমাণ দেরী করল, যা এক রুকন আদায় করার সমপরিমাণ সময়। তাহলেও সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

সাজদায়ে সাহু সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়

১। ইমামের ভুলের কারণে ইমাম-মুজাদী উভয়ের উপর সাজদায়ে সাহু দেয়া ওয়াজিব।

২। ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়রত অবস্থায় মুজাদীর ভুল হলে, মুজাদীর উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। তবে ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুজাদী তার অবশিষ্ট সালাত আদায় করার সময় ভুল হলে সাজদায়ে সাহু করা মুজাদীর উপর ওয়াজিব।

৩। ইমামের উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হওয়ার কারণে তিনি যখন সাজদায়ে সাহু আদায় করবেন তখন মুক্তাদীও সাজদায়ে সাহু আদায়

করতে হবে।

৪। যার উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়েছে, সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছেড়ে দেয় (অর্থাৎ সাজদায়ে সাহু না করে) তাহলে তার গুনাহ হবে। ঐ সালাত পুনরায় আদায় করা তার উপর ওয়াজিব।

৫। যে ব্যক্তি ভুলে একাধিক ওয়াজিব ছেড়ে দিয়েছে, তার জন্যও একই নিয়ম। অর্থাৎ অন্যান্য ভুলের জন্য যেভাবে সাজদায়ে সাহু করা হয়, সে ব্যক্তি সেভাবেই সাহু সাজদা করবে। অধিক বার করতে হবে না।

৬। যে ব্যক্তি ভুলে ফরয সালাতের প্রথম বৈঠক না করে উঠে যাবে, সে সোজা হয়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত (ভুলের কথা মনে পড়লে) সাথে সাথে বসে যাবে। আর যদি সে দাঁড়ানোর অধিক নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তাহলে দাঁড়িয়ে যাবে এবং সাজদায়ে সাহু দিয়ে সালাত শেষ করবে। তবে যদি সে বসার নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তাহলে সে বসে পড়বে এবং এর জন্য সাজদায়ে সাহু দিতে হবে না।

৭। যদি কেউ নফল সালাতের প্রথম বৈঠক ভুলে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় তাহলেও সে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসে পড়বে। এর জন্য সে সাজদায়ে সাহু করবে।

৮। যে ব্যক্তি ফরয সালাতের মধ্যে ভুলে শেষ বৈঠক ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় সে পঞ্চম রাকাতের সাজদা করার পূর্ব পর্যন্ত (ভুলের কথা মনে পড়লে) বসে যাবে এবং সাজদায়ে সাহু করবে।

৯। যে ব্যক্তি ফরয সালাতের মধ্যে ভুলে শেষ বৈঠক ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় এবং সে পঞ্চম রাকাতের সাজদা করে ফেলে তখন তার জন্য উচিত হলো সে আরও এক রাকাত মিলিয়ে মোট ছয় রাকাত পড়বে। এই ছয় রাকাত তার জন্য নফল হয়ে যাবে। এই ভুলের জন্য সাজদায়ে সাহু দিতে হবে। যেহেতু এই সালাত নফল হয়ে যাবে, তাই আবার ফরয সালাত পড়তে হবে।

১০। যে ব্যক্তি সালাতের শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়ার পর সালাম না ফিরিয়ে ভুলে দাঁড়িয়ে যায়, তার জন্য বিধান হলো সে দাঁড়ানো থেকে বসবে এবং আবার তাশাহুদ পড়া ব্যতীত সালাম ফিরাবে। সাজদায়ে সাহু করতে হবে না।

১১। যে ব্যক্তির উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়েছে, সে যদি ভুলবশতঃ সাজদায়ে সাহু না করে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করে ফেলে, তাহলে সে যতক্ষণ পর্যন্ত কিবলার দিক থেকে না ফিরবে কিংবা কোন কথা না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সাজদায়ে সাহুর কথা মনে পড়লে সাজদায়ে সাহু আদায় করবে।

১২। যে ব্যক্তি চার রাকাত সালাত আদায় করার সময়ে দুই রাকাত আদায় করার পর তার কাছে মনে হলো চার রাকাত হয়েছে। এরপর সে সালাত সম্পূর্ণ হয়েছে মনে করে সালাম ফিরিয়ে ফেলেছে। সালাম ফিরানোর পর মনে হয়েছে যে, আসলে সালাত সম্পূর্ণ হয় নি। সালাত চার রাকাতের ক্ষেত্রে দুই রাকাত হয়েছে। তখন সে আগের দুই রাকাতের সাথে আরও দুই রাকাত যুক্ত করবে এবং সালাত শেষে সাজদায়ে সাহু আদায় করবে।

(আল-ফিকহুল মুয়াসসার)

সাজদায়ে সাহু আদায়ের পদ্ধতি:

যার উপর সাজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়েছে, সে শেষ বৈঠকের তাশাহুদ শেষ করার পর ডান দিকে একটি সালাম ফিরাবে। এরপর আল্লাহু আকবার বলে সালাতের সাজদার ন্যায় দুটি সাজদা করবে। অতঃপর বসে আবার তাশাহুদ পড়বে। দরুদে ইবরাহীম পড়বে। এরপর কুরআন-সুন্নাহ বর্ণিত যে কোন দুআ করা যায়। হযরত আবু বকর রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটি দুআ শিক্ষা দিন

যা আমি সালাতের মধ্যে পড়তে পারি। তখন তিনি বললেন, তুমি সালাতের মধ্যে এই দু'আটি পড়বে।

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ
عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(সহীহ বুখারী ৮৩৪)

এরপর সালাম ফিরাবে।

(আল-ফিকহুল মুয়াসসার)

সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ ও মাকরুহ সময়

সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ সময়:

সালাত আদায়ের নিষিদ্ধ কিছু সময় রয়েছে।

নিষিদ্ধ সময়ে ফরয সালাত

হোক বা ওয়াজিব, কোনো সালাত আদায় করা জায়েয নয়। নিষিদ্ধ সময় হচ্ছে তিনটি।

১. সূর্যোদয়ের সময় থেকে সূর্য সামান্য উপরে উঠা পর্যন্ত। এর আনুমানিক সময় হলো ১২/১৩ মিনিট।

২. সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার পর থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা হেলে যাওয়া পর্যন্ত।

৩. সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া থেকে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত।

হাদীসে এসেছে-

أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ
حَتَّى تَرْتَفَعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই কথা বলতে শুনেছি যে, ফজরের পর সূর্য একটু উপরে

না উঠা পর্যন্ত এবং আসরের পর সূর্য অস্তমিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো সালাত নেই, অর্থাৎ অন্য কোনো সালাত আদায় করা যাবে না। (সহীহ বুখারী, ৫৮৬)

নোট: এই হাদীস থেকে এ কথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সময় যে কোন ধরনের সালাত নিষিদ্ধ। তবে ঐ দিনের আসরের সালাত এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। ঐ দিনের আসরের সালাত সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়ার পরও পড়া যায়। সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে সালাত আদায় করা মাকরুহ। মাকরুহ হলেও পড়ে নেওয়া উচিত। কেননা, ফরয তো আদায় হবে।

ঠিক দ্বি-প্রহরের সময় সালাত আদায় নিষেধ সম্পর্কিত হাদীস-

عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ السُّلَمِيُّ قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ أَخْبَرَنِي عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِ شَيْطَانٍ وَحَيْثُ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَ الظِّلُ بِالرُّمَحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنْ حِينَئِذٍ تُسَجِّرُ جَهَنَّمَ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنِ شَيْطَانٍ وَحَيْثُ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ. ُ

হযরত আমর ইবনে আবাসা আস-সুলামী রাদি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! যেসব বিষয় আমি জানি না এবং মহান আল্লাহ আপনাকে শিখিয়েছেন, এমন বিষয় থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দিন। আমাকে সালাত সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তুমি সালাতুল ফজর আদায় করবে। এরপর সূর্য পূর্বাকাশে উচু হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকবে। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিং এর মাঝখানে উদ্ভিত হয়, এবং ঐ সময় সূর্যপুজারীরা সূর্যকে সাজদা করে।

অতঃপর সূর্য যখন উঁচু হয় তখন সালাত আদায় করবে। কেননা সালাত মহান আল্লাহর নিকট উপস্থিত করা হয়। এরপর যখন বর্ষার ছায়া সংক্ষিপ্ত হয় (অর্থাৎ সূর্য মধ্যগগনে চলে যায়) তখনও সালাত পড়বে না। কেননা এ সময় জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয়। এরপর ছায়া যখন দীর্ঘ হতে থাকে তখন সালাত পড়বে। স্মরণ রাখবে, সকল সালাত মহান আল্লাহর সমীপে উপস্থিত করা হয়। আর আসরের সালাত আদায় করার পর

সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্য কোনো সালাত পড়বে না। কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিং এর মাঝখানে অস্ত যায় এবং ঐ সময় সূর্যপুজারীরা সূর্যকে সাজদা করে । (সহীহ মুসলিম, ১৯৬৭)

আমর ইবনে আবাসা রাদি, বর্ণিত হাদীস থেকে পরিষ্কার জানতে পেরেছি যে, সালাত আদায়ের কিছু কিছু নিষিদ্ধ সময় রয়েছে। ঐ নিষিদ্ধ সময়ে ফরয সালাত হোক বা ওয়াজিব, কোনো সালাত আদায় করা জায়েয নয়।

১. সূর্যোদয়ের সময় থেকে সূর্য সামান্য উপরে উঠা পর্যন্ত। এর আনুমানিক সময় হলো ১২/১৩ মিনিট।

২. সূর্য মধ্য আকাশে স্থির হওয়ার পর থেকে পশ্চিম দিকে কিছুটা হেলে যাওয়া পর্যন্ত।

৩. সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়া থেকে ডুবে যাওয়া পর্যন্ত। তবে ঐ দিনের আসরের সালাত এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। ঐ দিনের আসরের সালাত সূর্য হলুদ বর্ণ হওয়ার পরও পড়া যায়।

উল্লেখিত সময়গুলোতে যদি জানাযা উপস্থিত হয় তাহলে জানাযার সালাত পড়া জায়েয আছে, তবে মাকরুহ হবে। কেউ যদি আয়াতে সাজদাহ তিলাওয়াত করে তাহলে তিলাওয়াতে সাজদাহ আদায় করা জায়েয আছে, তবে এটাও মাকরুহের সাথে আদায় হবে।

উল্লেখিত তিনটি সময়ে সকল নফল সালাত পড়া মাকরুহে তাহরীমি।

যে সব সময়ে নফল সালাত আদায় করা মাকরুহ

কিছু সময় আছে এমন, যে সময়গুলোতে নফল সালাত পড়া মাকরুহ।

আর তা হচ্ছে-

১. সালাতুল ফজরের সময় হওয়া থেকে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত সালাত ব্যতীত অন্য কোনো নফল সালাত আদায় করা।

২. ফজরের ফরয সালাতের পর সূর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো নফল সালাত আদায় করা।
৩. সালাতুল আসরের পর থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো নফল সালাত আদায় করা।
৪. জুমার দিনে খতীব সাহেব আরবি খুতবা শুরু করার পর থেকে ফরয সালাত শেষ করা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোনো নফল সালাত আদায় করা। ৫. সালাতের জন্য ইক্বামত বা তাকবীর বলার সময় কোনো নফল সালাত পড়া। তবে ফজরের সুন্নাত সালাত এই বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ ইমাম সাহেবকে ফজরের দ্বিতীয় রাকআতে পাবার নিশ্চয়তা থাকলে ফজরের সুন্নাত সালাতকে ইক্বামতের সময়েও পড়া জায়েয আছে। তখন সুন্নাত সালাতকে মসজিদের কোণে পড়া উচিত।
৬. ঈদের সালাতের পূর্বে। অতএব ঈদের সালাতের পূর্বে সালাত আদায়ের মাঠে হোক বা ঘরে কিংবা মসজিদে হোক যে স্থানেই ঈদের সালাতের পূর্বে নফল সালাত পড়া মাকরুহ।
৭. ঈদের সালাতের পরে কেবল ঈদের মাঠে নফল সালাত পড়া মাকরুহ। সুতরাং ঈদের সালাত আদায় করার পর ঘরে নফল সালাত মাকরুহ হবে না।
৮. বেশি ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার সামনে এলে এবং খাবারের প্রতি প্রচণ্ড চাহিদা থাকলে।
৯. মল মূত্র ও বায়ু ত্যাগের চাপ থাকলে। ফরয হোক বা নফল, সব সালাতই মাকরুহ।
১০. এমন কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হলে যা মনোযোগ অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয় এবং সালাতের বিনয়কে নষ্ট করে দেয়।
১১. শুধু হাজী সাহেবদের জন্য আরাফাতে যোহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত আদায় করা।

১২. শুধু হাজী সাহেবদের জন্য মুজদালিফাতে মাগরিব এবং ইশারের মধ্যবর্তী সময়ে নফল সালাত আদায় করা।

সালাত আদায়ের প্রাকটিকাল পদ্ধতি

→কোনো দিকে না তাকিয়ে এবং অন্য দিকে না ফিরে পুরো শরীরে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে।

→অন্তরে নিয়ত করবে।

→ ‘আল্লাহু আকবার’ বলে তাকবীরে তাহরিমা বাঁধবে এবং তাকবীর দেওয়ার সময় দুই হাত কাঁধ বরাবর উঠাবে।

• ডান হাতের কজি বাঁ হাতের কজির ওপর রেখে নাভির নিচে রাখবে।

তারপর ছানা পড়বে, আর তা হচ্ছে :

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك

• অতঃপর ‘আউযুবিলাহি মিনাশাইতনির রাজীম’ বলবে।

‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ বলে সূরা আল-ফাতিহা পড়বে:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

• তারপর কুরআন থেকে যা সহজ মনে হয় তা পড়বে, ফজরের সালাতে ক্বিরাত লম্বা করবে।

• তারপর ‘আল্লাহু আকবার’ বলে রুকুতে যাবে অর্থাৎ আল্লাহর সম্মানে- তার পিঠকে ঝুঁকাবে, সূনাত হচ্ছে তার পিঠকে মাথা বরাবর নোয়াবে এবং দুই হাত হাটুতে রেখে আঙ্গুলগুলো ফাঁকা করে রাখবে।

• রুকুতে তিনবার বলবে সুবহানা রব্বিয়াল ‘আযীম, বলবে।

- সামি‘আল্লাহ্ লিমান হামিদাহ বলে রুকু থেকে উঠবে

- রুকু থেকে উঠে বলবে ‘রব্বানা ওয়ালাকাল হামদ,

আল্লাহ্ আকবার বলে বিনয়ের সাথে প্রথম সিজদাহ'য় যাবে এবং তার সাতটি অঙ্গে সিজদাহ করবে: নাকসহ কপাল, দুই হাত, দুই হাটু এবং দুই পায়ে সামনের অংশ। তার বাহুদ্বয় তার পার্শ্ব থেকে ফাঁকা রাখবে, দুই হাত মাটিতে বিছাতে পারবে না এবং আঙ্গুলের মাথাগুলো কিবলামুখী রাখবে।

- সিজদাহ'য় তিনবার বলবে: 'সুবহানা রবিবয়াল আ'লা’”

আল্লাহ্ আকবার বলে সিজদাহ থেকে মাথা উঠাবে।

দুই সিজদাহ'র মাঝে ডান পা খাড়া রেখে বাঁ পায়ের ওপর বসবে এবং হাত উরুর ওপর হাটুর নিকটে রাখবে।

দুই সিজদাহ'র মাঝে বসাবস্থায় বলবে: ‘রবিবগ ফিরলী ওয়ারহামনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুকনী, ওয়াজবুরনী ওয়া আফিনী।’

আল্লাহ্ আকবার বলে বিনয়ের সাথে দ্বিতীয় সিজদাহ'য় যাবে, প্রথম সিজদাহ'র মতো যা বলার এবং করার তা করবে।

আল্লাহ্ আকবার বলে দ্বিতীয় সিজদাহ থেকে উঠে প্রথম রাকাআতের মতো দ্বিতীয় রাকাআত সম্পন্ন করবে কিন্তু এতে ছানা বলবে না।

- দ্বিতীয় রাকাআতের; দু-সিজদা শেষ করে আল্লাহ্ আকবার বলে বসবে যেভাবে বসেছিল দুই সিজদাহ'র মাঝে।

এ বৈঠকে তাশাহুদ | এবং যদি দুই রাকাতের সালাত হয়; তাহলে দরুদে ইবরাহিম এবং দোআয়ে মা'ছুরা] পড়বে:

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

তারপর “আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ” বলে প্রথমে ডানে পরে বাঁয়ে সালাম ফিরাবে।

• আর যদি সালাত তিন রাকাত বা চার রাকাত বিশিষ্ট হয় তবে প্রথম তাশাহুদ (আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আল্লা মুহাম্মাদান আবদুহু অরাসূলুহ) বলার পর আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যাবে তার বাকী সালাত দ্বিতীয় রাকাতের মতো পুরা করবে, কিন্তু এতে শুধু সূরা আল-ফাতিহা পড়বে।

এ বৈঠকে তাশাহুদ এবং দুরুদ- দোআয়ে মাসুরা পুরোটা পড়বে।

তারপর “আস সালামু আলাইকুম অয়া রাহমাতুল্লাহ” বলে প্রথমে ডানে ; পরে বাঁয়ে সালাম ফিরাবে।

(ফিকহুস সালাত)

সালাতে খুশু-খুযু অর্জনের পদ্ধতি

‘সালাত’ অন্য সকল ইবাদত থেকে ভিন্ন ধরনের ইবাদত। এ ইবাদতটি হল সরাসরি আল্লাহ তাআলার দরবারে হাজিরা দিয়ে তাঁর মহান স্বত্ত্বার সামনে দন্ডায়মান হয়ে তাঁর সাথে কথোপকথনের এক অপূর্ব মুহূর্ত। এ কারণেই সালাত অবস্থায় একাগ্রতা ও খুশুখুযুর প্রতি যেভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, অন্য কোনো ইবাদতের বেলায়

তেমনটি করা হয়নি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- ‘ঐ সকল মুমিন সফলকাম, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র। (সূরা মুমিনুন ১-২)

খুশু-খুযু সালাতের প্রাণ। সালাতের বাইরের কল্পনা খুশু-খুযুকে নষ্ট করে দেয়। যেমন, ব্যবসা-বানিজ্য, দোকান-পাট, জায়গা-জমি, গরু-ছাগল, ব্যাংক-ব্যাংলস, টাকা-পয়সা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, অনলাইন-অফলাইন, ফেইসবুক, টুইটার, বন্ধু-বান্ধব, পরিবার, সমাজ, দেশ, রাজনীতি,

সমাজনীতি, অর্থনীতি, লেখা-পড়া এবং চাকুরীসহ বিভিন্ন কাজের প্রতি আকর্ষণ আমাদের সালাতের মনোযোগ নষ্ট করে দেয়। আমাদের ব্রেইনকে ব্যস্ত করে দেয়। ফলে আমরা সালাতে পুরোপুরি মনোযোগী হতে পারি না। খুশু-খুযু আনতে পারি না সালাতের মধ্যে। এ সব দিক থেকে ব্রেইনকে ফিরিয়ে সালাতের মধ্যে খুশু-খুযু আনার কিছু পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতি বা কৌশলগুলো গ্রহণ করলে ইনশাআল্লাহ আশা করা যায় আমাদের সালাতের মধ্যে খুশু- খুযু আসবে।

পদ্ধতি-১ : সালাতের মধ্যে শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষার দুআ আবুল আলা রাডি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَنَّ عُمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ خَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي يُلْبِسُنِي عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَنَعَوِذُ بِاللَّهِ مِنْهُ وَالْقُلُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي.

হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস রাডি. বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! শয়তান আমার ও আমার সালাতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে এবং ক্বিরাতের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, ঐটা একটা শয়তান। ওর নাম খিনযিব/খানযাব। যখন তুমি ওর উপস্থিতি অনুভব করবে তখন বলবে ‘আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।’ এরপর তোমার বুকের বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে। হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস রাডি. বলেন, আমি এই

আমলটি করলাম। ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমার থেকে শয়তানকে দূর করে দিলেন (সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৮৬৮)

উল্লেখ থাকে যে সালাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে কোনো সময় এবং যে কোনো অবস্থায় এরূপ হলে তখন আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম বললে এবং থুথু নিক্ষেপ করলেও সালাতের কোনো ক্ষতি হবে না।

পদ্ধতি-২ : সালাতকে জীবনের শেষ সালাত মনে করা :

সালাতের মধ্যে যদি এই ধ্যান করা হয়, এই সালাতই হয়তো আমার জীবনের শেষ সালাত। এরপর হয়তো আমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। তাহলেও সালাতে একাগ্রতা সৃষ্টি হবে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে নসিহত করুন। তখন তিনি তাকে কয়েকটি নসিহত করেছিলেন। এর মধ্যে প্রথম নসিহতটি ছিল-

إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَاةَ مُؤَدِّعٍ

যখন তুমি সালাতে দাড়াবে, তখন তুমি মনে করবে এটা তোমার বিদায়ী (জীবনের শেষ) সালাত। (সুনানু ইবনে মাজাহ, ৪১৭১)

এই ধ্যান করে সালাত আদায় করলে আশা করা যায় সালাতের মধ্যে খুশু-খুযু আসবে। ইনশাআল্লাহ।

পদ্ধতি-৩ : আমি আল্লাহকে দেখছি অথবা আল্লাহ আমাকে দেখছেন:

সালাত শুরু করার পর এ কল্পনা করি, আমি আল্লাহ তায়ালাকে দেখছি। অন্যদিকে মন যাওয়া মাত্রই একথা কল্পনা করি। এতে সালাতে মনোযোগ সৃষ্টি হবে। এ কল্পনাও করি, আমি কীভাবে সালাত পড়ছি, কীভাবে তিলাওয়াত করছি, কীভাবে উঠা-বসা এবং রুকু-সাজদা করছি, তা সবই আল্লাহ দেখছেন। মনে মনে ভাবতে থাকা। দেখবো খুশু-খুযু সৃষ্টি হচ্ছে। এ কথাগুলো হাদীসে খুব সুন্দরভাবে উল্লেখিত হয়েছে। যেমন

أَنَّ الْعَيْنَ اللَّهُ كَأَنَّ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرِ اللَّهُ

তুমি এমনভাবে ইবাদত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, যদি এমনটা মনে না হয় তাহলে মনে করতে হবে তুমি তাঁকে (আল্লাহকে) দেখছ। (সহীহ বুখারী- ৫০ এবং ৪৭৭৭; সহীহ মুসলিম,- ১০২ এবং ১০৬)

পদ্ধতি-৪ : অর্থ ও মর্ম বোঝার জন্য ব্রেইনকে ব্যস্ত রাখা

আমরা দীর্ঘদিন তিলাওয়াত, তাসবীহ এবং যিকির করার কারণে এখন এগুলো রোবটের মতো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। ফলে আমাদের ব্রেইন ভিন্ন একটি কাজ অনুসন্ধান করতে থাকে। সে ব্যবসা- বানিজ্য, দোকান-পাট, জায়গা-জমি, গরু- ছাগল, ব্যাংক-ব্যালেন্স, টাকা- পয়সা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে, অনলাইন-অফলাইন, ফেইসবুক, বন্ধু-বান্ধব এবং লেখা-পড়া এবং বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তখন আমরা সালাতে অমনোযোগী হয়ে যাই। আমাদের খুশু-খুযু থাকে না। এ জন্য সালাতের তিলাওয়াত, তাসবীহ এবং যিকিরের অর্থ ও মর্মের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কুরআন তিলাওয়াত করার সময় তার অর্থের প্রতি অবশ্যই অনেক মনোযোগী হতে হবে। রুকু-সাজদা করার সময় তাসবীহগুলোর অর্থের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ ব্রেইন অন্য দিকে যাবে না। কারণ ব্রেইন একই সাথে দুটি কাজ সমান মনোযোগী হয়ে পরিচালনা করতে পারে না। এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে আশা করা যায় সালাতের মধ্যে একাগ্রতা সৃষ্টি হবে। তবে কিছু দিন পর ঐ সূরা এবং আয়াতও যান্ত্রিক পদ্ধিতে পঠিত হতে থাকবে। এই জন্য নতুন সূরা এবং আয়াত মুখস্ত করে তা দিয়ে সালাত আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ খুশু-খুযু ঠিক থাকবে।

পদ্ধতি-৫ : সালাতে পঠিত শব্দগুলো নিজের কানে লাগিয়ে পড়া

সালাতে পঠিত তিলাওয়াত, তাসবীহ ও যিকিরের শব্দের প্রতি মনোযোগ দেয়া। সেগুলো লক্ষ্য করে গভীরভাবে ভাবা। একা একা সালাত পড়ার সময় তিলাওয়াত ও যিকিরের বাক্যগুলো একটু জোড়ে উচ্চারণ করা। যেন আওয়াজ নিজ কানে পৌঁছে। তবে খেয়াল রাখা তা যেন কারও ইবাদত বা অন্য কোনো আমলে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

পদ্ধতি-৬ : সালাতকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার উপযুক্ত করা

একটু লক্ষ্য করি, আমরা যেই সালাত আদায় করছি তা জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার জন্য কতটুকু সুন্দর হয়েছে। কী পরিমাণ সুন্দর হওয়া উচিত ছিল।

পদ্ধতি-৭ : মানবিক প্রয়োজন সমাধান করা

পেশাব-পায়খানার চাপ নিয়ে সালাতে দাড়ানো ঠিক নয়। পেশাব-পায়খানা এবং অন্যান্য প্রয়োজন সমাধান করে সালাতের মধ্যে দাঁড়ানো উচিত। নতুবা খুশু-খুযু আসবে না।

পদ্ধতি-৮ : আমি তো মহান আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছি:

একথা ভাবা, দুনিয়ার রাজা-বাদশার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে কেউ অন্যমনস্ক হয় না। তাহলে আমি সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহর সঙ্গে কথা বলছি, তাহলে আমি অন্যমনস্ক হই কীভাবে?

পদ্ধতি-৯ : আযানের পর দুআ পাঠ করা।

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مُمَحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ

হে আল্লাহ! এ পরিপূর্ণ আহ্বান এবং প্রতিটি সালাতের মালিক, আপনি প্রদান করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওসীলা (নৈকট্য এবং মহা মর্যাদা)। তাঁকে উন্নীত করুন সম্মানিত অবস্থানে, যা আপনি তাঁকে ওয়াদা করেছেন। (সহীহ বুখারী, ৬১৪)

পদ্ধতি-১০ : ওযূর পূর্বের দুআ পাঠ করা :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিছমিল্লাহ / বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ।

আল্লাহর নামে / পরম করুণাময় আল্লাহর নামে । (আবু দাউদ, ১০২)

নোট: ওযূর আগে এই দুআ ছাড়া অন্য কোনো দুআ নেই। অথচ আমাদের দেশে অনেকে নাওয়াইতু আন.... ইত্যাদি দুআ পড়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ হাদীসে এমন কিছুই নেই।

পদ্ধতি-১১ : সালাতের মাসআলা এবং ফযিলতের প্রতি লক্ষ্য রাখা:

সালাতে দাড়ানোর সময় একথা লক্ষ্য রাখা ভালো যে, সালাত আদায় করার সময় কিছু কাজ আছে যা সালাত নষ্ট করে দেয়। আবার কিছু কাজ এমনও আছে যা সালাতকে নষ্ট করে না, তবে সালাতের সওয়াবকে কমিয়ে দেয়। সালাতের অনেক ফযিলত থেকে কিছু ফযিলত মুখস্ত রেখে তা সালাত আদায়ের সময় লক্ষ্য করলে আশা করা যায় সালাতের মধ্যে খুশু- খুযু সৃষ্টি হবে।

পদ্ধতি-১২ : ওযূর শেষের দুআ পাঠ করা:

اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين

হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো।' (তিরমিযি, ৫৫)

ফযিলত: যে এই দুআ পড়বে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। ((তিরমিযি, ৫৫)

পদ্ধতি-১৩ : সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন এবং আরামদায়ক পোশাক পরিধান করা : মহান আল্লাহ বলেন-

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد

হে আদম সন্তান! যখনই তোমরা কোনও মসজিদে আসবে তখন নিজেদের শোভার বস্ত্র (পোশাক) নিয়ে আসবে। (সূরা আরাফ, ৭:৩১)

পদ্ধতি-১৪ : দৃষ্টিকে সালাতের সাজদার স্থানে নিবদ্ধ রাখা। প্রয়োজনে সুতরা ব্যবহার করা।

পদ্ধতি-১৫ : জামাতে সালাত আদায় করলে কাতার সোজা করে দাড়ানো।

পদ্ধতি-১৬ : সালাতের পূর্ব থেকেই মসজিদে গিয়ে অপেক্ষা করা।

পদ্ধতি-১৭ : সালাতের মধ্যে হাই এলে সাধ্যমতো ঠেকানো উচিত।

পদ্ধতি-১৮ : যে সব সালাতের পূর্বে সুন্নত আছে তা আদায় করা।

পদ্ধতি-১৯ : সালাতের প্রতিটি কাজ ধীরস্থিরভাবে আদায় করা।

পদ্ধতি-২০ : খাবার প্রস্তুত থাকলে তা খেয়ে সালাতে দাড়ানো।

পদ্ধতি-২১ : প্রতিটি আয়াত থেমে থেমে পড়া।

পদ্ধতি-২২ : সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জন করা। পদ্ধতি-২৩ : আযানের জবাব দেওয়া।

পদ্ধতি-২৪ : সুগন্ধি ব্যবহার করা।

নোট:সবগুলো পদ্ধতি একসাথে অনুসরণ করার চেষ্টা করলে মস্তিষ্কের উপর অধিক চাপ সৃষ্টি হবে। যা ঠিক হবে না।আমরা কয়েকটি করে জীবনে প্রেক্ষিস করতে পারি।কিছু অভ্যাসে পরিণত হলে আর কিছু এইভাবে ইনশাআল্লাহ।

সালাতের ফযিলত

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَ رُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرُ
لِّلذَّكَرِينَ.

দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে নামায কায়েম করো। নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়। যারা উপদেশ গ্রহণ করে তাদের জন্য এটা এক উপদেশ।
(সূরা হুদ (১১) : ১১৪)

সালাতের দুনিয়া ও আখিরাতের কতিপয় উপকারিতা,ফলাফল ও ফযিলত:

১। সালাত হিফায়ত বা সংরক্ষণকারীর জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আল্লাহ বান্দার ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন, যে তা হিফাযত করল তার জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি হলো যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন...। (আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবন মাজাহ)

২। যে ব্যক্তি সালাতের হিফাযত করল তার জন্য সালাত জ্যোতি ও প্রমাণ হবে: অর্থাৎ সালাত তার ঈমানের দলীল হবে এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের কারণ হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে সালাতের হিফাযত করল সালাত তার জন্য জ্যোতি, প্রমাণ ও কিয়ামতের দিন মুক্তির কারণ হবে।

৩। সালাত বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ১৭]

“আর সাজদাহ কর ও (আমার) নিকটবর্তী হও।” (সূরা আল-আলাক, আয়াত: ১৯)

অর্থাৎ আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং সমস্ত সৎ কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, আর সৎ কাজের মধ্যে আল্লাহর জন্য সাজদাহ হচ্ছে সবচেয়ে বড়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “বান্দা স্বীয় রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সাজদাহ অবস্থায়। অতএব, তোমরা সাজদায় বেশি-বেশি দো‘আ কর। (সহীহ মুসলিম ও নাসাঈ)

সালাতই হচ্ছে আপনার ও আল্লাহর মাঝে সম্পর্ক গড়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। অতএব, আপনি যদি চান তবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে (সালাতের মাধ্যমে) বেশি-বেশি সাজদাহ ও রুকু মাধ্যমে এ সম্পর্ক বৃদ্ধি করুন। এ জন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতে বেশি-বেশি দো‘আ করার ওসীয়াত করেছেন।

৪। সালাত গুনাহ ও মন্দ কাজের কাফফারা:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে কোনো মুসলিম ব্যক্তি সালাতের ওয়াক্ত পেল আর সালাতের জন্য উত্তমরূপে অযু করল যথাযথ খুশু-খুযু নিয়ে সালাত আদায় করল, ঠিকমত রুকু করল। এ সালাত তার বিগত গুনাহের কাফফারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে। আর এই ফযীলত সব সময়ের জন্য।” (সহীহ মুসলিম)

উক্ত হাদীসের শেষ অংশের দিকে লক্ষ্য করুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেছেন: “যতক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হবে” কেননা কবীরা গুনাহ খাঁটি ও আন্তরিক তাওবা ব্যতীত মাফ হবে না।

৫। সালাত সর্বোত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত: আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন: সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন, “সময়মত সালাত আদায় করা”। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) বলেন, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, “পিতা-মাতার সাথে সৎ ব্যবহার করা”। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) বলেন, আমি বললাম: তারপর কী? তিনি বললেন: “আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

৬। সালাতের মধ্যে রয়েছে ইহকালীন ও পরকালীন আত্মিক প্রশান্তি-আরাম এবং চক্ষু শীতলতা: আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ২৮]

“জেনে রাখ! আল্লাহর যিকিরেই আত্মা প্রশান্ত হয়। [সূরা আর-রা‘দ, আয়াত: ২৮]

আর সম্পূর্ণ সালাতই আল্লাহর যিকির বরং সালাত আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রবর্তন করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ১৪]

“আমার যিকিরের (স্মরণের) জন্য সালাত প্রতিষ্ঠা কর।” [সূরা তাহা, আয়াত: ১৪]

এ জন্যই মুসলিমগণ সালাতের মধ্যে অর্জন করে সুখ-শান্তি ও আরাম। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন, “উঠো বিলাল এবং আমাদেরকে সালাতের মাধ্যমে আরাম পৌঁছাও। (মুসনাদে আহমদ)

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “আমার চক্ষু প্রশান্তি সালাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে।” (সুনান নাসাঈ)

পক্ষান্তরে সালাত পরিত্যাগকারী হলো আল্লাহর যিকির (সালাত) বিমুখ, আর আল্লাহ তা‘আলা তাঁর যিকির থেকে বিমুখদের জন্য তার জীবন-যাপন সংকুচিত করার ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেন,

(وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى [طه:]

[১২৬

“যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্য তার জীবন-যাপন হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১২৪]

এটা কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, আমরা সাধারণত সালাতে অলসতাকারীদেরকে দেখতে পাবো যে, তারা আত্মিক অস্থিরতা, স্নায়ুর চাপ ও নানা ধরনের মানসিক যন্ত্রনায় ভুগে।

৭। সালাত মুসলিমের ইহকাল ও পরকালের কাজ কর্মে সহায়ক: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

(وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) [البقرة: ১৫০]

“তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। [সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ৪৫]

এ জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যায় পতিত হতেন তখনই ভয় ও ভীতির সঙ্গে দ্রুত সালাত পড়তে যেতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু

আনছ বলেন, “যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সম্মুখীন হতেন তখন সালাত আদায় করতেন।” (মুসনাদে আহমদ)

সাবেত রহ. বলেন, “নবীগণ যখন কোনো বড় কাজের সম্মুখীন হতেন সালাতের দিকে অগ্রসর হতেন। (তাফসীর ইবন কাসীর)

কারণ, সালাতই হলো বান্দা এবং তার রবের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম, যেমন ইতোপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব মুসলিম যখন কোনো কাজের মনস্থ করবে সে মহিমাম্বিত আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যাঁর হাতে রয়েছে সব কিছুর ক্ষমতা, যিনি কোনো ব্যাপারে বলেন হয়ে যাও, আর তা হয়ে যায়, যিনি আতঁর অসহায়ের আস্থানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: ٦٢]

“নাকি তিনি যিনি অসহায়ের আস্থানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন?” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬২]

সালাতে অবহেলাকারী যখন কোনো বড় সমস্যায় পতিত হয় এবং বিপদে আচ্ছন্ন হয় তখন সে কার স্মরণাপন্ন হবে? সে তো আল্লাহ তা‘আলার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বা সে তো শুধু কঠিন ও বিপদের সময় সালাত আদায় করে। অতএব, এ সালাত তার না কোনো উপকারে আসবে, না আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে তুলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, “তুমি আল্লাহকে সুখে-সাচ্ছন্দে চেন, আল্লাহ তোমাকে বিপদে-আপদে চিনবে। (মুসনাদ আহমদ)

অবশ্য কেউ যদি কঠিন বিপদে-আপদে আল্লাহর নিকট তাওবা করে এবং সালাতের হিফায়তের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, তবে আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা কবুল করেন।

৮। সালাতে রয়েছে ইহকাল ও পরকালের সফলতা:

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ ٢﴾ [المؤمنون: ১, ২]

“অবশ্যই মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র।” [সূরা আল-মুমিন, আয়াত: ১-২]

ইহুস্কাল ও পরকালের সফলতা:

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۝﴾ [الاعلا: ১৪, ১৫]

“নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে, এবং তার রবের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।” [সূরা আল-আ‘লা, আয়াত: ১৪-১৫]

আয়াতে উল্লিখিত “ফালাহ” শব্দটি এমন ব্যাপক যার অর্থ দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ বুঝায়।

৯। সালাতের মধ্যে রয়েছে রুযীর প্রশস্ততা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝﴾ [طه: ১৩২]

“এবং তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও আর তাতে অবিচল থাক, আমরা তোমার নিকট কোনো রুযী চাই না, আমরাই তোমাকে রুযী দেই এবং শুভ পরিণাম তো তাকওয়াধারীদের জন্য।” [সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৩২]

ইবন কাসীর রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, “অর্থাৎ যদি সালাত প্রতিষ্ঠা কর এমনভাবে তোমার নিকট রুযী আসবে যার তুমি ধারণাও করতে পারবে না।”

১০। সালাত আত্মার যাকাত, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা:

সালাত অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার এক দুর্ভেদ্য দূর্গ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ৪৫]

“তুমি পাঠ কর কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয়েছে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা কর, সালাত অবশ্যই অল্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।” [সূরা আল-‘আনকাবূত, আয়াত: ৪৫]

অর্থাৎ সালাত সংরক্ষণকারী এবং গুরুত্ব দানকারী নিজের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি অনুভব করবে এবং সে অতিসত্বর অল্লীল ও মন্দ আচরণ থেকে বিরত থাকবে।

১১। সালাত ইহকাল ও পরকালে মুমিনদের জন্য দৃঢ়তা ও স্থিরতা আনে: অতএব, সালাত আদায়কারীর যখন সুখ আসে তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর তা তার জন্য উত্তম এবং যখন কোনো বিপদ দেখা দেয় তখন ধৈর্য ধারণ করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর। কিন্তু বেনামাযীর অবস্থা এর বিপরীত। উক্ত অবস্থায় সে হা-হতাশ ও অতি কৃপণতা শুরু করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝ ١٩ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۝ ٢٠ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۝ ٢١ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۝ ٢٢ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ۝ ٢٣﴾ [المعارج: ১৯, ২৩]

“মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থিরচিত্ত রূপে। যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে তখন সে হা-হতাশ করে। আর যখন কল্যাণ তাকে স্পর্শ করে, সে অতি কৃপণ হয়। তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত। যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।” [সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত: ১৯-২৩]

১২। সালাত বান্দার জন্য ইহকাল ও পরকালে হিফায়ত ও নিরাপত্তামূলক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا تَحْزِرُوا اللَّهَ فِي عَهْدِهِ، فَمَنْ قَتَلَهُ طَلَبَهُ اللَّهُ حَتَّى يَكْبَهُ فِي النَّارِ، عَلَى وَجْهِهِ»

যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) সালাত আদায় করল সে আল্লাহর জিম্মায় (নিরাপত্তায়), কেউ যেন আল্লাহর এ জিম্মাদারী নষ্ট না করে। যে কেউ তাকে হত্যা করবে, আল্লাহ তাকে পাকড়াও করবেন এবং তাকে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে অধোমুখে নিক্ষেপ করবেন।” (সহীহ মুসলিম)

১৩। সালাত আদায়ের ফলে আল্লাহ তা‘আলার ভালবাসা অর্জন হয়: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ} [التوبة: ১০৮]

“আল্লাহ বেশি বেশি পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে পছন্দ করেন। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: ১০৮]

আর সালাত আদায়কারী ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা পবিত্রতা অর্জন করা সালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত।

নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও অন্যায কাজ থেকে বিরত রাখে

ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল সালাত। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ.

কিয়ামত দিবসে বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে সালাতের মাধ্যমে। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৬৯৪৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৮৬৬)

হযরত উমর রা.-এর প্রসিদ্ধ বাণী-

إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ. فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافِظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ دِينَهُ. وَمَنْ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ.

নিশ্চয়ই আমার কাছে তোমাদের সবচে’ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সালাত। যে ব্যক্তি সালাতের হেফাযত করল, যত্ন সহকারে তা আদায় করল, সে তার দ্বীনকে হেফাযত করল। আর যে তাতে অবহেলা করল, (দ্বীনের) অন্যান্য বিষয়ে সে আরো বেশি অবহেলা করবে। -মুয়াত্তা মালেক, বর্ণনা ৬; মুসান্নাফে আবদুর রযযাক, বর্ণনা ২০৩৮

সালাত মূলত খোদাপ্রদত্ত এক মহান নিআমত। রাক্বুল আলামীনের এক বিশেষ উপহার, যা বান্দাকে সকল প্রকার অশ্লীলতা, পাপাচার, প্রবৃত্তিপূজা, ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসের অন্ধ মোহ থেকে মুক্ত করে পূত-পবিত্র ও উন্নত এক আদর্শ জীবনের

অধিকারী বানিয়ে দেয়। বিকশিত করে তোলে তার ভেতরের সকল সুকুমারবৃত্তি। তার জন্য খুলে দেয় চিরস্থায়ী জান্নাতের সুপ্রশস্ত দুয়ার।

সালাত হচ্ছে হিকমাহপূর্ণ এক অলৌকিক তরবীয়ত-ব্যবস্থা। সালাতের মাধ্যমেই ইখলাস, আত্মশুদ্ধি ও আত্মবিলোপের মহৎ গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে, যা বান্দাকে পৌঁছে দেয় আল্লাহর সান্নিধ্যের স্বর্ণশিখরে।

সালাত এমন এক নিয়ন্ত্রক শক্তিতে পূর্ণ যে, খাঁটি মুসল্লি নামাযের বাইরের পরিবেশেও এমন কোনো কাজ করতে পারে না, যা মানুষের দৃষ্টিতে সালাতের ভাব-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে। অদৃশ্য থেকে মূলত সালাতই নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে তার রাত-দিনের সকল গতিবিধি। শয়তানের ধোঁকায় যদি মুসল্লি কখনো কোনো অন্যায় বা অশোভনীয় কাজে লিপ্ত হতে চায় তখন নামাযের তরবীয়তে দীক্ষিত বিবেক তাকে বলে, তুমিই বল, একটু পরে যখন তুমি সালাতে তোমার মহান প্রভুর সামনে দাঁড়াবে তখন কি তোমার এই ভেবে লজ্জাবোধ হবে না যে, কেমন কালো মুখ ও কলুষিত হৃদয় নিয়ে তুমি আপন মালিকের সামনে দাঁড়াচ্ছ? যিনি অন্তর্যামী, তোমার গোপন-প্রকাশ্য সকল বিষয়ে সম্যক অবগত। যিনি ছাড়া তোমার আর কোনো ইলাহ নেই। যিনি তোমার একমাত্র আশ্রয়দাতা, যাঁর সামনে তোমাকে বার বার দাঁড়াতে হবে। যার কাছে তোমার সকল চাওয়া-পাওয়া। প্রতিটি মুহূর্তে তুমি যাঁর মুখাপেক্ষী। এগুলো জানার পরও কি তুমি তাঁর নাফরমানিতে লিপ্ত হবে? সালাত এভাবে মুসল্লিকে উপদেশ দিতে থাকে এবং পাপাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা দেয়। আল্লাহ তাআলার ঘোষণা-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

নিশ্চয়ই সালাত অন্যায় ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে। -সূরা আনকাবূত (২৯) :

৪৫

ইমাম তবারী, ইবনে কাসীর, কুরতুবী, আলুসীসহ সংখ্যাগরিষ্ঠ তাফসীরকারের মত অনুসারে আয়াতের মর্ম হল, তাকবীর, তাসবীহ, কেয়াত, আল্লাহর সামনে কিয়াম ও রুকু-সিজদাহসহ অনেক আমলের সমষ্টি হচ্ছে সালাত। এ কারণে সালাত যেন

মুসল্লিকে বলে, তুমি কোনো অশ্লীল বা অন্যায় কাজ করো না। তুমি এমন প্রভুর নাফরমানী করো না, যিনি তোমার কৃত ইবাদতসমূহের প্রকৃত হকদার। তুমি এখন কীভাবে তাঁর অবাধ্য হবে, অথচ তুমি এমন আমল করেছে, যা তাঁর বড়ত্ব ও মহত্বকে প্রকাশ করে। এরপরও যদি তাঁর অবাধ্য হও তবে এর মাধ্যমে তুমি স্ববিরোধী কাজে লিপ্ত হলে। (আর স্ববিরোধী কাজের মাধ্যমে ব্যক্তি কোন্ স্তরে নেমে আসে সেটা তোমার ভালোই জানা আছে।) -রুহুল মাআনী, ১০/৪৮২

প্রতিদিন প্রতি ওয়াক্ত সালাতে প্রতি রাকাতে বান্দাহ বলতে থাকে-

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ.

[(তুমি) কর্মফল-দিবসের মালিক।] আর তার স্মরণ হতে থাকে, তাকে কাল কর্মফল দিবসে মালিকের সামনে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং তাঁর নাফরমানী থেকে, তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে হবে। কোনো গুনাহ যদি সালাতের আগে হয় তাহলে তার গুনাহের কথা স্মরণ হয় ও লজ্জাবোধ হয়; বান্দা অনুতপ্ত হয় এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করে। তেমনি যদি কোনো গুনাহের নিয়ত থাকে তখন বান্দার মনে হয়, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো; কাল কিয়ামতের দিনও তাঁর সামনে দাঁড়াতে হবে। তাহলে কীভাবে আমি সালাতের পর অমুক গুনাহ করার কথা ভাবতে পারি! এভাবে সালাত বান্দাকে গুনাহ থেকে ফিরিয়ে রাখে, কৃত গুনাহ থেকে পবিত্র করে।

তেমনিভাবে আমরা সালাতের শুরুতে যে ছানা পড়ি-

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ...

এখানে পড়ার আরেকটি দুআও রয়েছে, যে দুআর মধ্যে বান্দা গুনাহ থেকে দূরে থাকার তাওফীক প্রার্থনা করে-

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ...

(হে আল্লাহ! পূর্ব-পশ্চিমের যেমন দূরত্ব; আমার মাঝে আর গুনাহের মাঝে তুমি তেমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও।)

তো বান্দা যখন সালাতে দাঁড়িয়ে এ কথা বলে, তখন অবচেতনেই সে গুনাহ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে এবং আল্লাহ তার প্রার্থনা কবুল করেন এবং তাকে গুনাহ থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করেন। এভাবে সালাত বান্দাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে।

দিনের শেষে বিতির সালাতে আমরা দুআ কুনূত পড়ি। সে দুআতে এমন অনেক বাক্য রয়েছে, যাতে বান্দা নিজ গুনাহের কথা স্মরণ করে, মাফ চায়, গুনাহ না করার সংকল্প করে। যেমন দুআর শুরুতেই আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে বান্দা বলে-

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ.

(ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমারই সাহায্য চাই। তোমারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।)

দিন শেষে বান্দা যখন গাফুরুর রাহীমের সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে তো বান্দার সারাদিনের সকল পাপের কথা স্মরণ হয়ে যায়। সাথে ভবিষ্যতে পাপ না করার সংকল্প ব্যক্ত করে। কারণ, কৃত গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য প্রধান শর্তই হল, ভবিষ্যতে এ গুনাহ আর না করার সংকল্প।

একপর্যায়ে বান্দা বলে-

نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ.

(আমরা তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি; অকৃতজ্ঞ হই না।)

রবের নাফরমানীর চাইতে বড় অকৃতজ্ঞতা আর কী হতে পারে!

সালাত বান্দাকে শুধু রবের নাফরমানী থেকেই বিরত রাখে না; বরং নাফরমান থেকেও দূরে রাখে। দুআ কুনূতে বান্দা বলে-

وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ.

(যে তোমার নাফরমানী করে আমরা তাকে ত্যাগ করি, বর্জন করি।)

সবশেষে বান্দা সকল প্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সংকল্প ব্যক্ত করে বলে-

وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ.

(আমরা তোমার আযাবকে ভয় করি।)

এ সংকল্প সারাদিন বান্দাকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। কৃত গুনাহ থেকে তওবা করার তাকিদ দেয়। এভাবেই গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা, গোনাহগার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সংকল্প আর আল্লাহর আযাবের স্মরণ বান্দাকে সকল প্রকার অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।

এ তো গেল দিনের শেষে বান্দার গুনাহের স্মরণ ও ক্ষমা প্রার্থনার কথা; এ ছাড়াও প্রতি সালাতের শেষেই তো বান্দা বলে-

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ،
وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

ইয়া আল্লাহ! আমি (তোমার নাফরমানীর মাধ্যমে) নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি। আর আপনি ছাড়া গুনাহ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। আপনি নিজ অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি রহম করুন। নিঃসন্দেহে আপনিই ক্ষমাকারী, করুণাময়।

যে বান্দা রবের সামনে দাঁড়িয়ে বারবার ‘যালামতু নাফসী’-‘নিজের উপর যুলুম করেছি’ বলে স্বীকারোক্তি দেয় এবং হৃদয়ে তা ধারণ করে সে কি সালাতের বাইরে এ স্বীকারোক্তির বিপরীত করতে পারে? রাব্বের কারীমের, গাফুরুর রাহীমের নাফরমানী করতে পারে?

এভাবেই সালাত বিরত রাখে বান্দাকে সকল অন্যায়-অনাচার থেকে।

সবচেয়ে বড় কথা হল, দিনের পাঁচটি সময়ে পাঁচবার মহান প্রভুর সামনে দাঁড়ানোই তো বান্দাকে গুনাহ থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট। দিবস-রজনীর বিভিন্ন মুহূর্তে সে যত গুনাহ করে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর সাথে সাথেই তার গুনাহের কথা স্মরণ হয়ে যায়, সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। কারণ সে তো দাঁড়িয়েছে ‘আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাতি’র সামনে, যিনি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব জানেন। সে তো দাঁড়িয়েছে ‘আলীমুম বিযা-তিস সুদূর’-এর সামনে, যিনি অন্তরের সংকল্পও জানেন।

এর দ্বারা যেমন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার পাথেয় অর্জন হয়, সংকল্প করার তাওফীক হয় তেমনি এ কারণে গুনাহও মাফ হয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِّمَا بَيْنَهُنَّ.

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায তার মাঝের গুনাহসমূহকে মিটিয়ে দেয়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৩১

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করল, অমুক ব্যক্তি রাতে সালাত আদায় করে আর দিনের বেলায় চুরি করে। নবীজী বললেন-

سَيِّئُهَا مَا تَقُولُ.

তুমি যা বলছ (অর্থাৎ তার সালাত) তা শীঘ্রই তাকে (এ অন্যায় থেকে) বিরত রাখবে। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৭৭৮; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ২৫৬০

এক ব্যক্তি দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করত। যখন তার সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসউদ রা.-কে বলা হল, তিনি বললেন, সালাত তার জন্যই ফলদায়ক হয়, যে সালাতের আনুগত্য করে। অতপর তিনি আয়াত পাঠ করলেন-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

নিশ্চয়ই সালাত অশোভন ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। [সূরা আনকাবূত (২৯) : ৪৫] -মুসল্লাফে ইবনে আবি শায়বা, হাদীস ৩৫৬৯৬; তাফসীরে তবারী, ১৮/৪০৮; তাফসীরে ইবনে আবি হাতেম, ৯/৩০৬৬

হযরত শুআইব আ.-এর ঘটনা থেকেও বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝে আসে- সালাত অন্যায় থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর নবী হযরত শুআইব আ. যখন তাঁর জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন এবং মাপে কম দেয়াসহ সকল প্রকার অনাচার পরিহার করে পূত-পবিত্র জীবন যাপনের আহ্বান জানালেন তখন তাঁর অবাধ্য সম্প্রদায় তার প্রতি আপত্তি জানিয়ে বলল-

أَصْلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَنْزُرَكَ مَا يَغْبُذُ أَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ.

তোমার ‘সালাত’ কি তোমাকে এই নির্দেশই দেয় যে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের উপাস্য বস্তুকে ত্যাগ করব কিংবা আমরা বিরত থাকব আমাদের ধন-সম্পদ নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করা থেকে? তুমি তো বেশ বুদ্ধিমান ও ধার্মিক লোক! [সূরা হূদ (১১) : ৮৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সুফিয়ান রাহ. বলেন, আল্লাহর শপথ, নিশ্চয়ই সালাত (ভালো কাজের) আদেশ এবং (মন্দ কাজ থেকে) নিষেধ করে। -তাফসীরে তবারী ১৮/৪০৯

সালাত কখন অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে?

প্রকৃত অর্থেই সালাত মুসল্লিকে অন্যায় ও অশোভন কাজ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু তা কখন? এ ঘোষণার চূড়ান্ত ফল লাভ করার জন্য কোনো শর্ত রয়েছে কি না? এক্ষেত্রে মুসল্লিরও কিছু করণীয় ও বর্জনীয় আছে কি না? এটা অবশ্যই যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন। অনেক আয়াত ও হাদীস থেকেই এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায়। এখানে শুধু একটি আয়াত ও একটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে। আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন-

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ.

দুর্ভোগ এসকল মুসল্লির, যারা তাদের সালাত থেকে উদাসীন। যারা শুধু (মানুষদেরকে) দেখানোর জন্য সালাত আদায় করে। -সূরা মাউন (১০৭) : ৪-৫

অতএব স্পষ্ট যে, মুসল্লি মাত্রই সালাতের এই মহা সুফল লাভ করবে, বিষয়টি এমন নয়। সালাতের মধ্যে উদাসীনতা মুসল্লির জন্য সুফল নয়; বরং কুফল বয়ে আনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ مَنْ أَحْسَنَ وَضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لَوْفَتْهُنَّ، فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

আল্লাহ তাআলা বান্দাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওয়ু করবে এবং যথাসময়ে সালাত আদায় করবে- এভাবে যে, রুকু-সিজদা ও খুশু পূর্ণরূপে সম্পাদন করবে, তার জন্য আল্লাহ পাক ক্ষমার (অন্য বর্ণনায়, জান্নাতের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর যে ব্যক্তি (এসব) করবে না তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। ইচ্ছা হলে মাফ করবেন নতুবা শাস্তি দিবেন। - মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৭০৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪২৫

নবীজীর এই পবিত্র ইরশাদ থেকে বোঝা যায়, সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে একটি ‘আব্দ’ বা চুক্তি সম্পাদিত হয়। আর সে চুক্তিটি একটু বিস্তর। এর জন্য কিছু অপরিহার্য শর্ত রয়েছে, যার অন্যতম হল, সালাতে খুশু-খুযু অবলম্বন করা এবং রুকু-সিজদা ধীরস্থির ও যথাযথভাবে সম্পাদন করা।

মূলত সালাতের গুণগত মান হিসাবেই তা মুসল্লিকে পাপাচার ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عَشْرُهَا، تُسْعُهَا، ثَمَنُهَا، سُبُعُهَا، سُدُسُهَا، خُمُسُهَا، رُبُعُهَا، ثُلُثُهَا نِصْفُهَا.

নিশ্চয়ই বান্দা সালাত সম্পন্ন করে আর তার জন্য লেখা হয় সালাতের দশ ভাগের এক ভাগ (প্রতিদান) অথবা নয় ভাগের এক ভাগ অথবা আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের এক ভাগ অথবা সে পায় সালাতের অর্ধেক (প্রতিদান)। এক বর্ণনায় এসেছে অথবা সে পায় সালাতের পূর্ণ প্রতিদান ও সুফল। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১৮৮৯৪; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৭৯৬

অর্থাৎ যদি সালাতটি আদায় করা হয় পূর্ণ খুশু-খুযুর (হৃদয়ের একাগ্রতা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার) সাথে এবং তিলাওয়াত ও তাসবীহসমূহও পাঠ করা হয় যথাযথভাবে। ফরয,

ওয়াজিব, সুন্নত ও আদবসমূহও সম্পাদন করা হয় উত্তমরূপে। তবে সেই মুসল্লিকে আখেরাতে পূর্ণ প্রতিদান ও সওয়াব দান করা হবে এবং দুনিয়াতে তা মুসল্লিকে মন্দ ও অশোভন কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। পক্ষান্তরে যে সালাত হয় অন্তঃসারশূন্য আনুষ্ঠানিকতা, যা সীমাবদ্ধ থাকে নিছক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে, যাতে রুকু-সিজদা, কিরাত-কিয়াম যথাযথভাবে সম্পাদন করা হয় না সেই সালাত কীভাবে মুসল্লিকে অন্যায়ে ও অশোভন কাজ থেকে বাঁচাবে? তার সালাত তো তাকে সালাতরত অবস্থাতেই অশোভন কাজ ও চিন্তা থেকে ফিরাতে পারছে না। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.

সফলকাম সেসকল মুমিন, যারা সালাতে খুশু-খুযু অবলম্বন করে। (সূরা মুমিনুন ২৩: ১-২)

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের পরিচয় দিতে গিয়ে অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ.

তাদের লক্ষণ তাদের মুখমন্ডলে সিজদার প্রভাব পরিস্ফুট থাকবে। (সূরা ফাৎহ (৪৮) : ২৯)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুজাহিদ রাহ. থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন-

ليس بهذا الأثر الذي في الوجه ولكنها الخشوع.

এখানে কপালে সেজদার দাগ উদ্দেশ্য নয়; উদ্দেশ্য হল, ‘খুশু’। -ওয়াকী ইবনুল য়ারাহ, আযুহদ ২/৫৯৮, হাদীস ৩২৭; তাফসীরে সুফিয়ান ছাওরী পৃ. ২৭৮; ইবনুল মুবারক, আযুহদ পৃ. ৮৯

আল্লামা আলুসী রাহ. বলেন-

الخشوع التذلل مع خوف وسكون للجوارح.

‘খুশু’ হল, অন্তরের ভয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতার সাথে চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় প্রকাশ করা। -রুহুল মাআনী ৯/২৭৫

প্রখ্যাত মুফাসসীর হাফেয ইবনে কাসীর রাহ. বলেন, সালাতে খুশু-খুযূর দৌলত তাঁরই হাছিল হয়, যে নিজের অন্তরকে সবকিছু থেকে ফিরিয়ে শুধু সালাতের মধ্যেই নিবিষ্ট রাখে। -তায়সীরে ইবনে কাছীর ৩/২৯৫

যখন কেউ এমন খুশু-এর সাথে সালাত আদায় করে তখনই সালাত তার চক্ষু শীতল করে, অন্তরের প্রশান্তির কারণ হয়। যেমনটি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ.

সালাতেই দান করা হয়েছে আমার চক্ষুর শীতলতা। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ১২২৯৩; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৯৩৪০)

অন্য হাদীসে বেলাল রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

يَا بِلَالُ! أَقِمِ الصَّلَاةَ، وَأَرْحِنَا بِهَا.

সালাতের ব্যবস্থা করে আমাকে শান্তি দাও, হে বেলাল!। (সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৮৫)

এটাই তো সালাত সম্পর্কে একজন মুমিনের অনুভূতি হওয়া উচিত। সালাত তার জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল, অন্তরের প্রশান্তি, শান্তির আধার। পক্ষান্তরে মুনাফিক এবং যারা সালাতে খুশু-খুযূ অবলম্বন করে না তাদের জন্য সালাত মহা কঠিন কাজ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ.

সালাতকে অবশ্যই কঠিন মনে হয়। তবে খুশু-খুযূ (অর্থাৎ ধ্যান ও বিনয়) অবলম্বনকারীদের জন্য নয়। (সূরা বাকারা (২) : ৪৫)

আরেক আয়াতে মুনাফিকদের চরিত্র সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

وَ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُنَ النَّاسَ وَ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.

(নিশ্চয়ই মুনাফিকরা) যখন সালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসতার সাথে দাঁড়ায়। তারা মানুষকে দেখায় আর আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। (সূরা নিসা (৪) : ১৪২)

তো নামাযে খুশু-খুযু মুমিনের গুণ। পক্ষান্তরে খুশু-খুযু বিহীন অলসতার সাথে নামায মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য। আর খুশু-খুযু ওয়ালা নামাযই নামাযীকে সকল অন্যায়-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।

আসলে মুমিনের সালাত খুশু-খুযু বিহীন হতেই পারে না; কারণ সে তো মহান প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে কি দেহ-মন বিনীত না হয়ে পারে? আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে কি মুমিন আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দিকে মনোনিবেশ করতে পারে? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী অপূর্ব শৈলিতে এ কথায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন-

إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّيَ إِنَّمَا يَقُومُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيُنْظَرْ كَيْفَ يُنَاجِيهِ.

তোমাদের কেউ যখন নামাযে দণ্ডায়মান হয় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে আলাপ করে। সুতরাং তার উচিত সে কিভাবে আলাপ করছে সেদিকে যথাযথভাবে লক্ষ রাখা। (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ৮৬১; সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ৪৭৪)

হযরত সা'দ বিন উমারাহ রা. এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন-

صَلِّ صَلَاةَ مُوَدَّعٍ.

যখন তুমি সালাত আদায় কর, তো এমনভাবে আদায় কর যেন এটাই তোমার জীবনের শেষ সালাত। (আলমুজামুল কাবীর, তবারানী, বর্ণনা ৫৪৫৯; আলইছাবা, ইবনে হাজার ৩/৭০; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হায়ছামী ১০/২৩৬, বর্ণনা ১৭৭৩৯)

প্রসিদ্ধ হাদীস 'হাদীসে জিবরীল'-এ সকল ইবাদতের একটি মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে। তাতে ফুটে উঠেছে খুশু-খুযুর চূড়ান্ত রূপ-

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

ইহসান হচ্ছে, আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর তুমি তাঁকে না দেখলেও তিনি তো (অবশ্যই) তোমাকে দেখছেন। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০)

এই হাদীসের মূল কথাও ‘খুশু’। সুতরাং কথা এটাই যে, সালাতের চূড়ান্ত সুফল অর্জন করতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই সালাতে খুশু-খুযু অবলম্বন করতে হবে। খুশু-খুযু ওয়ালা নামাযই মুমিনকে সকল অন্যায়-অনাচার, অপকর্ম-অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখে।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে সালাতের বহুবিধ উপকারীতা

সুস্বাস্থ্যের জন্য সালাত এক কার্যকরী মহাঔষধ। ওজু থেকে শুরু করে সালাত আদায় সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি কাজই মানুষের সুস্থতার সঙ্গে সম্পর্কিত।

একজন মুসলিমের জন্য প্রতি দিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করা ফরজ। এটি মহান আল্লাহর নির্দেশ। এ বিধান লঙ্ঘনে রয়েছে কঠোর শাস্তির ঘোষণা। অথচ সালাত পড়লে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অনেক উপকার সাধিত হয়।

সালাতের মধ্যে স্বাস্থ্যগত বহুবিধ উপকারীতার বিবরণ:

সালাতের একাধিক শারীরিক ও শরীর বৃত্তীয় উপকারীতা রয়েছে। সালাতের সময় শরীরের অধিকাংশ পেশী এবং জয়েন্টগুলোর ব্যায়াম হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো রুকু-সাজদার শারীরিক নড়াচড়া, হাত-পায়ের, পেছনের এবং পেরেনিয়াম পেশীর (Perineum muscles) ধারাবাহিকভাবে ব্যায়াম হয়। সালাত এক ধরনের মানসিক থেরাপি। যা আত্মাকে শান্ত ও সুখী রাখে এবং সেই সঙ্গে সমস্ত দুঃচিন্তা থেকে মুক্ত রাখে। সম্প্রতি রিপোর্টে এসেছে যে, নিয়মিত সালাত আদায়কারী একজন ব্যক্তির সাধারণত বাত জাতীয় রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা কম থাকে। সালাতের কারণে প্রায় সব প্রধান হাড় ও জয়েন্টগুলোতে ব্যায়াম হয়ে থাকে। ডাউফেশ (Doufesh) এর একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, স্যাম্পট্রিক স্নায়ুতন্ত্রের (Parasympathetic) কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায় এবং সহানুভূতিশীল স্নায়ুতন্ত্রের (Sympathetic) কার্যকলাপ হ্রাস পায়। এইভাবে নিয়মিত সালাত আদায় মনের ভার হালকা করতে, উদ্বেগকে হ্রাস

করতে এবং কার্ডিওভাসকুলার (Cardiovascular) বুঁকি হ্রাসে সহায়তা করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে, সালাতের দাঁড়ানো ও সাজদারত অবস্থায় যথাক্রমে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন হৃদস্পন্দন এইচ আর (HR) তৈরী করছে। নিম্ন এইচ আর (HR) একক ব্যক্তির স্বাস্থ্যের জন্য সম্ভাব্য সুবিধার হতে পারে। সালাতের সময় ও সালাতের পরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সিস্টোলিক (Systolic) এবং ডায়াস্টোলিক (Diastolic) যথেষ্ট পরিমাণে রক্তচাপ হ্রাস পায় সালাতরত অবস্থায়। প্রকৃতপক্ষে সালাতের প্রত্যেক কাজে আত্মিক উপকারীতার সাথে স্বাস্থ্যগত উপকারীতাও জড়িত।

সালাত মুমিনের শরীর নরম এবং সতেজ রাখে:

সালাত আদায় করতে হলে ওযু করতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ওযুর মধ্যে তিনবার গড়গড়া করে কুলি করা এবং সমস্ত মুখমণ্ডল তিনবার ধৌত করা। নাকে পানি দেওয়া। কনুইসহ তিরবার হাত ধৌত করা। সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা। উভয় কান মাসেহ করা। দুই পায়ের টাকনুসহ ধৌত করা। এভাবে একজন মুমিন দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার ওযু করার মাধ্যমে শরীরকে ময়লা এবং জীবানু থেকে মুক্ত করেন। এতে শরীর নরম এবং সতেজ থাকে।

দুশ্চিন্তামুক্ত, মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে:

রমযান মাসে প্রত্যেক মুসলমানকে অতিরিক্ত ২০ রাকাত সালাত আদায় করতে হয়। যার প্রতি চার রাকাত পরপর দুই মিনিটের একটি বিরতি থাকে। রমযান মাসে ইফতারের ঠিক আগ মুহূর্তে ক্ষুধার কারণে রক্তে গ্লুকোজ এবং ইনসুলিনের মাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। ইফতারের পর আহরিত খাদ্য রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা বাড়াতে থাকে। আর এর সঙ্গে প্লাজমা ইনসুলিনও কয়েক ঘন্টার মধ্যে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা অনেক বেড়ে যায় এবং যখনই কেউ সালাত শুরু করে তখন সেই গ্লুকোজ মাংসপেশী, যকৃত এবং আরও অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়া গ্লুকোজ বিপাকের

মাধ্যমে কার্বন-ডাই অক্সাইডও পানিতে রূপান্তর হয়। যা সালাত তথা শারীরিক নড়াচড়ার ফল। আর এটা শরীরকে সাবলীল, দুশ্চিন্তামুক্ত, মানসিক চাপ কমাতে কমাতে সাহায্য করে। যা শরীরের জন্য খুবই ভালো।

ক্যালরী কমাতে এবং সহনশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে:

এছাড়াও তারাবীর সালাত মুমিনের সহনশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। কারণ তারাবীর ২০ রাকাত সালাত একটানা শারীরিক নড়াচড়ার মাধ্যমে আদায় করতে হয়।

হাড়ের ক্ষয় রোধ করে এবং কলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে:

এছাড়াও আমাদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটি রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি। এর নাম 'অস্টিওপোরোসিস' (Osteoporosis) যার কারণে বৃদ্ধ বয়সে আমাদের হাড়ের ক্ষয় সৃষ্টি হয়। হাড় দুর্বল ও চিকন হয়ে যায়। এর কারণ হলো হাড়ে খনিজ উপাদান ও স্পঞ্জিনেসের (Sponginess) অভাব। যাই হোক, নিয়মিত সালাত আদায়ে এই রোগ প্রতিরোধ হয়। কারণ সালাতে নিয়মিত শারীরিক নড়াচড়া পুনরাবৃত্তি হয় যা টেনডন তথা রগের ক্ষমতা বাড়ায়। হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা সংরক্ষন করে এবং মাংশপেশীর শক্তি ও নমনীয়তা বাড়ায়। একটি উদ্দীপক হরমোন আছে, এ্যাড্রেনালীন (Adrenaline) যা ছোটখাট কাজের কারণে নিঃসরন হয়। এর নিঃসরন উদ্দীপনা তথা কাজ শেষেও হতে থাকে। 'সিমপেথেটিক নার্ভাস সিস্টেম' (Sympathetic Nervous System) আমাদের শরীরে 'মোটর নার্ভ' (Motor Nerves) সরবরাহ করে। যা শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও হৃদযন্ত্রের পেশীকে নমনীয় করতে সাহায্য করে। আর এই নার্ভাস সিস্টেমটি সক্রিয় করতে তারাবীর সালাতই যথেষ্ট। তাই যখন এ্যাড্রেনালিন (Adrenaline) হরমোন নিঃসরন হয়, এটা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃদস্পন্দনের হারকেও বাড়িয়ে দেয়। হজম প্রক্রিয়া ধীর করে দেয়। রক্তচাপ বাড়ায় এবং গ্লুকোজ সরবরাহের জন্য গ্লাইকোজেনকে (Glycogen) সচল করে দেয় যা টিস্যুকে সক্রিয় করে ও কঙ্কাল পেশীর ক্লান্তি দূর করে। একইভাবে সালাতের আরো

কিছু উপকারীতা হলো, এটা কলেস্টেরল কমাতে পারে। কারণ, নিয়মিত ব্যায়াম কলেস্টেরল (Cholesterol) কমানোর সবচেয়ে ভালো উপায়। আর সালাত হলো সবচেয়ে ভালো ব্যায়ামগুলোর একটি উন্নত ব্যায়াম।

শরীরে এবং মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি করে:

তাকবীর বলার সময় আমাদের হাত ও কাঁধ নাড়াতে হয় যা ধড়ের মধ্যে রক্ত প্রবাহ বাড়ায় এবং এটা শরীরে রক্ত সরবরাহ ভালো করে। তাশাহুদের সময় বসা অবস্থায় শরীর হালকা ও দুশ্চিন্তামুক্ত হয়। এছাড়াও সালাত শরীরকে অনেক রোগ থেকে রক্ষা করে যেমন- বাত, গিটে ব্যাথা, পক্ষাঘাত ইত্যাদি। সাজদার সময় যখন আমরা মাটিতে কপাল স্পর্শ করি তখন মস্তিষ্কে নতুন করে রক্ত সরবরাহ হয়। অনেক যোগ ব্যায়ামে এই ধারণাটি প্রয়োগ করা হয়।

সালাত স্মরণশক্তি এবং মনোযোগ বৃদ্ধি করে:

বলা হয়েছে যে, নির্ভুলভাবে সালাত আদায় করলে দাঁড়ানো, রুকুতে যাওয়া, সাজদাহ করা এবং প্রতি দুই সাজদার মাঝখানে বসা ইত্যাদির মাধ্যমে শরীরের নড়াচড়ার মধ্যে একটি চমৎকার স্বাচ্ছন্দ সাদৃশ্য ও সমন্বয় তৈরী করে। ফলে, যারা নিয়মিত সালাত আদায় করে তাদের ভারিকোজ তথা শিরা ফুলে যাওয়া রোগ আক্রমণ করে না বললেই চলে। আবার সাজদা সালাতের সেই অংশ যেখানে মাথা হৃৎপিণ্ডের নিচে অবস্থান করে। তাই রক্তের নিম্নগতির জন্য এই সময় মাথায় রক্তের গতি বেড়ে যায়, যা স্মরণশক্তি, মনোযোগ এবং মনোজ্ঞানোর ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখে:

এছাড়াও সাজদার সময় সাইনাসে প্রবাহের সৃষ্টি হয়। যা স্বাস্থ্যকর। যার ফলে সাইনাসের ব্যাথা কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একজন মানুষ যখন স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালায় তখন সে টেনে নেওয়া বাতাসের দুই তৃতীয়াংশ বাতাস বের করে

দেয়। আর এক তৃতীয়াংশ বাতাস ফুসফুসে রয়ে যায়। আমরা যখন সাজদায় যাই তখন পেটের নিচের অংশে চাপ পড়ে। যা ডায়াফ্রমে চাপ দেয়। ডায়াফ্রম তখন ফুসফুসের নিচের অংশে চাপ দেয়। আর আমরা যদি সাজদার সময় শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া চালাই তখন থেকে যাওয়া সেই এক তৃতীয়াংশ বাতাসও বেড়িয়ে যায়। যা একটি স্বাস্থ্যকর ফুসফুসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবে সালাত হুৎপিন্ডের আকৃতিকেও ঠিক রাখে।

রুকুর স্বাস্থ্যগত উপকারীতা:

যেহেতু রুকু পিঠ বাঁকা করে এবং পা সোজা রেখে করতে হয় তাই শরীরের নীচের অংশের মাংসপেশীগুলোতে পশ্চাৎদেশ, উরু ও পায়ের আঙ্গুলে টান পড়ে। বারবার এই ধরনের নড়াচড়ায় শরীরের এই মাংসপেশীগুলো শক্তিশালী হয়। এছাড়াও রুকুতে ধড়ের উপরের দিকে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যায় যা পাকস্থলী, পেট এবং কিডনীর মাংসপেশীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সাহায্য করে। রুকুর সময় পা এবং পাকস্থলীয় শয্যে সমকোন তৈরী হয়। এতে পাকস্থলীর মাংসপেশীর উন্নতি সাধন করে। এই অবস্থায় শরীরের সবচেয়ে উপরের অংশের মাথা, চোখ, কান এবং ফুসফুসেও রক্ত সঞ্চালন অনেক বেড়ে যায়।

সাজদার স্বাস্থ্যগত উপকারীতা:

যেহেতু মাথা হুৎপিন্ডের চেয়ে নিম্ন অবস্থানে থাকে, এ জন্য এটি মাথায় রক্ত সরবরাহ বৃদ্ধি করে। যার ফলে মানসিক স্বাস্থ্য যেমন- স্মৃতিশক্তি, ঘনত্ব এবং অন্যান্য মানসিক বিষয়গুলোতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এছাড়া সাজদার সময় এভডোমিনাল ভিসরা (Abdominal Visra পাতলা পর্দা) (Diaphram) এর উপর চাপ প্রয়োগ করে যা ফুসফুসের নিম্ন অংশে এবং নিচের লোব (Lobe) এর মধ্যে চাপ দেয়, যেটা ফুসফুসের জন্য স্বাস্থ্যকর।

সালাতের উপকারীতা বিষয়ক এই সেশনটি আমরা শেষ করতে চাচ্ছি এই বলে যে, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির (Harvard University) একজন বিশেষজ্ঞ, বেনসন (Benson) উল্লেখ করেছেন যে, পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে তারাবীর সালাত আদায় করতে থাকলে শরীরের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তার মতে, সালাতের এই ব্যায়াম যা গভীর চিন্তা থেকে মনকে বিরত রাখে। তা এক ধরনের বিনোদনের মত কাজ করে। এর ফলে রক্তচাপ কমে এবং অক্সিজেনের শোষণ কম হয়। কারন হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ও শ্বাসপ্রশ্বাসের হার কমে যায়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইসলামে সালাতের অনেক উপকারীতা আছে।

এই গবেষণাটিতে বিশ্বের মুসলিম-অমুসলিমসহ অনেক বড় বড় স্কলারগণ সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য ভিজিট করুন:

১. https://umexpert.umedu.my/file/publication/00013965_144929.pdf

২. <https://www.hiqma.com/>

নামাজের-শারীরিক-উপকারীতা ‘আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে সালাতের বহুবিধ উপকারীত’

লেখাটি ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্ব সাইফুল ইসলাম ভাই সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

(আমার সালাত বই থেকে)

ইসলামি স্কলারদের মতে, সালাত সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা দেয়। কেউ যদি জীবনে শৃঙ্খলা শিখতে চায়, সে যেন সালাত সম্পর্কে চিন্তা করে। সালাতের সময় প্রভু ও ভূত্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। সব মুসলমান যদি সঠিকভাবে সালাত আদায় করতে শুরু করে তবে কোরআনের ঘোষণা বাস্তবায়িত হবে, মুসলমানরা বিজয়ী হবে। দেহ, সমাজসংস্কার ও পরিশুদ্ধির উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হচ্ছে সালাত।

সালাত আদায় না করার পরিণাম

যারা সালাত আদায় করে না, জাহান্নামে তাদের শাস্তি কী হবে? সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন স্বপ্নে-দেখা এক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দেখা প্রত্যেকটি স্বপ্ন ওহি। আমাদের স্বপ্নের মতো না। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, স্বপ্নে দুজন ব্যক্তি আমার নিকটে এলেন এবং তারা বললেন, আমাদের অনুসরণ করুন, আমরা এক জায়গায় যাব। আমি তাদের সাথে গেলাম। আমরা এক শায়িত-ব্যক্তির কাছে এলাম। আর তার মাথার কাছে আরেকজন লোক বিশালাকারের পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি পাথরটি তুলে এনে ওই (শায়িত) ব্যক্তির মাথায় ছুড়ে মারেন, এতে ওই ব্যক্তির মাথার খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং পাথরটি গড়িয়ে যায়। গড়িয়ে-যাওয়া পাথরটি লোকটি আবার তুলে, যার মাথা চূর্ণ করা হয়েছিল সেই শায়িত-ব্যক্তির কাছে ফিরে আসেন। এই সময়ে সেই ব্যক্তির মাথা আগের মতো হয়ে যায়। একটু পূর্বেই যার মাথাকে চূর্ণ করা হয়েছিল আল্লাহ তাআলা তার মাথাটাকে পুনরায় স্বাভাবিক করে দেন।

ওই লোকটি পুনরায় পাথর ছুড়ে শায়িত-ব্যক্তির মাথা চূর্ণ করেন। পাথর গড়িয়ে যায়। লোকটি আবার গড়িয়ে-যাওয়া পাথরটি আনতে যান। আবারও শায়িত-ব্যক্তির মাথার খুলি পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। শাস্তিটি বারবার এভাবেই

চলতে থাকে।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই ব্যক্তিটি তার সাথে এমন করল কেন? তার মাথার-কাছে-দাঁড়িয়ে-থাকা ব্যক্তিটি তার মাথার খুলি চূর্ণ করছে কেন? আর প্রত্যেকবারই সে পাথরটি গড়িয়ে যাওয়ার পর তুলে নিচ্ছে, তার মাথাটিও পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে এবং সে পুনরায় তার মাথার খুলি চূর্ণ করছে, আর এ প্রক্রিয়া বারবার চলছে। কেন? এখানে কী হচ্ছে? তারা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-

কে উত্তর দিলেন, সে সালাতের সময় হলে সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকত ।
অথবা সালাতে যেতে এবং সালাত আদায় করতে অলসতা-প্রদর্শন করত ।”

(বুখারী,আস-সহীহ:৭০৪৭।মূল হাদীসটি অনেক দীর্ঘ)

এই হলো যারা সালাতের ওয়াক্ত চলে যাওয়া পর্যন্ত ঘুমাত, তাদের শাস্তি। যারা সম্পূর্ণভাবে সালাত ছেড়ে দেয় এখানে কিন্তু তাদের শাস্তির কথা বলা হচ্ছে না। শারঈ কোনো ওজর ব্যতীত যারা দিনের-পর-দিন সালাত কাযা করে, এটা হলো তাদের শাস্তি। চিন্তা করুন, যারা সালাত আদায়ই করে না তাদের ক্ষেত্রে কী ঘটবে? আল্লাহ কুরআনে বলেন,

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ
عَذَابًا

“অতঃপর এদের পর এমন নালায়েক লোকেরা এদের স্থলাভিষিক্ত হলো যারা সালাত নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির কামনার দাসত্ব করল। তাই শীঘ্রই তারা গোমরাহীর পরিণামের মুখোমুখি হবে। (সূরা মারইয়াম,১৯:৫৯)

এখানে তাদের পরবর্তী বংশধর বলতে আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহিস সালাম ও তাঁদের সঙ্গীদের বংশধরদের কথা বুঝিয়েছেন। নূহ আলাইহিস সালাম-এর সঙ্গীদেরকে আল্লাহ কত বড় ধ্বংস থেকে বাঁচিয়েছেন! অথচ তাদের অনুসারীরা ধ্বংসের সম্মুখীন। কেন? কারণ তারা সালাত নষ্ট করেছে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ

করেছে।

তারা একেবারেই সালাত আদায় করত না, ব্যাপারটা এমন না। বরং তারা সঠিক সময় ইখলাসের সাথে পরিপূর্ণভাবে সালাত আদায় করত না। তা হলে চিন্তা করি ওই মানুষদের জন্য কী শাস্তি অপেক্ষা করছে,যারা একেবারেই সালাত করে না?

فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

গাইযুন্ হলো তাদের শেষ আবাসস্থল।

আমরা কি জানি, জাহান্নামের ওই আবাসস্থলটি কী রকম?

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'গাইয়ুন হলো জাহান্নামের এক অত্যন্ত গভীর ও ভয়ঙ্কর উপত্যকার নাম। কেন এই উপত্যকা এত ভয়ঙ্কর, এত জঘন্য? জাহান্নামে মানুষের আকার হবে অনেক বড়। বসা অবস্থায় এক জাহান্নামীর আকার হবে ডেট্রয়েট থেকে শিকাগোর দূরত্বের সমান। (ডেট্রয়েট থেকে শিকাগোর দূরত্ব প্রায় ৪০০ কিলোমিটার।)

তার চামড়া এবং মাংস হবে অত্যন্ত পুরু এবং তার দেহে থাকবে অনেক মাংস। জাহান্নামের আগুনে এই মাংস পুড়ে যখন হাড় বেড়িয়ে যাবে, তখন আল্লাহ সেখানে আবার মাংস দিয়ে পূর্ণ করে

দেবেন।

আমরা কি কখনও আগুনে পুড়ে-যাওয়া মানুষ দেখেছি? আগুনে পুড়ে যাবার পর মাংসের মধ্যে অনেক পুঁজ জমে। এভাবে বারবার পুড়ে-যাওয়া মাংস এবং পুঁজ কোথায় গিয়ে জমা হবে আমরা কি জানি? এসব গিয়ে জমা হবে জাহান্নামের 'গাইয়ুন নামক উপত্যকায়। 'গাইয়ুন-এ কারা থাকবে?

যারা সময়মতো, সঠিকভাবে, নিখুঁতভাবে সালাত আদায় করেনি, তারা থাকবে মাংস ও পুঁজ-ভর্তি এ ভয়ঙ্কর উপত্যকায়। আমরা কি এই শাস্তি সহ্য করতে পারবো? আর আমরা যারা সালাত আদায়ই করিনা??

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ • فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ • عَنِ الْمُجْرِمِينَ • مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ • قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

“তবে ডান দিকের লোকেরা ছাড়া। যারা জান্নাতে অবস্থান করবে। সেখানে তারা অপরাধীদের জিজ্ঞাসা করতে থাকবে কীসে তোমাদের জাহান্নামে

নিষ্ক্ষেপ করল? তারা (অপরাধীরা) বলবে, আমরা সালাত আদায় করতাম না। (সূরা আল মুদ্দাসিসর, ৭৪:৩৯-৪৩ আয়াত)

ডান দিকের ব্যক্তির ছাড়া বাকি সবাই নিজেদের অপরাধের কারণে বন্দি। ডান দিকের ব্যক্তির জাহান্নাতের আনন্দ উপভোগ করবে, তারা জাহান্নামীদের নিয়ে আলোচনা করবে এবং তাদের উপহাস করবে। দুনিয়াতে উপহাস করা ঠিক নয়, আমরা লোকদের নিয়ে উপহাস করতে পারি না। কেননা আল্লাহই ভালো জানেন একজন ব্যক্তির জীবনে সর্বশেষে কী ঘটবে, তবে আখিরাতে, জাহান্নাতে উপহাস করার অনুমতি দেওয়া হবে। তারা বলবে,

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ

“কীসে তোমাদের সাকারে নিয়ে এলো?”

সালাত আদায় না-কারীদের জন্য আরও একটা আবাসস্থল হলো সাকার।

সাকারবাসীরা বলবে,

لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

“আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না।”

সাকার সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার আগে, কুরআনের এই আয়াতগুলোর দিকে লক্ষ্য করি, যেখানে আল্লাহ বলেছেন,

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ لَا تَبْقَى وَلَا تَذَرُ لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ

لَا

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

“আমি তাকে দাখিল করব ‘সাকারে’। তুমি কি জানো, সে সাকার কী? যা জীবিতও রাখবে না, আবার একেবারে মৃত করেও ছাড়বে না। গায়ের চামড়া ঝলসিয়ে দেবে। সেখানে নিয়োজিত আছে উনিশ জন (ফেরেশতা)। (সুরা মুদাসিসর, ৭৪:২৬-৩০ আয়াত)

সাকার হলো জাহান্নামের একটি উপত্যকা। যাকে সাকারে পাঠানো হবে তার কোনো দেহাবশেষও অবশিষ্ট থাকবে না। যত উচ্চ তাপমাত্রায়, যতক্ষণ ধরেই জ্বালানো হোক না কেন, দুনিয়ার আগুনে-পোড়া মানুষের শরীরের কিছু-না-কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকে।

কিন্তু সাকারের আগুন কোনো কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না। এই আগুন হাড়-মাংস পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। ব্যক্তির কোনো কিছুই অবশিষ্ট

থাকবে না।

জাহান্নামের পরবর্তী উপত্যকা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ *

“অতএব ‘ওয়াইল’ সেসব সালাত আদায়কারীর জন্য, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে বে-খবর। (সুরা মাউন, ১০৭:(৪-৫))

আমরা ‘গাইয়ুন’ সম্পর্কে জানলাম, সাকার সম্পর্কে জানলাম, জাহান্নামের আরেকটি উপত্যকা হলো ওয়াইল। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, দুর্ভোগ তাদের, যারা এক সালাতকে পরবর্তী সালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে। যে ওয়াক্ত পার হয়ে যাবার পর ফরজ সালাত পড়ে, আসরের ওয়াক্ত হবার পর যুহরের সালাত পড়ে, এমন ব্যক্তির আবাসস্থল হবে ‘ওয়াইল’। সাহাবিগণের মতে, ‘ওয়াইল’ হলো জাহান্নামের এমন একটি উপত্যকা যেখানে জাহান্নামীকে সাপ ও জীব-জন্তুরা খেয়ে ফেলবে। তারপর সে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে। আবারও সাপ এবং জীব-জন্তুরা তাকে খেয়ে ফেলবে। এভাবে তার শাস্তি চলতে থাকবে। কাকে এভাবে শাস্তি দেওয়া হবে? এমন ব্যক্তি, যে সালাত আদায় করে ঠিক, তবে দেরি করে আদায় করে। যে নিয়মিত ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত কায়া করে। তো, যে ব্যক্তি সালাত আদায়ই করে না, তার ক্ষেত্রে কী ধরনের উপত্যকা ও কী ধরনের শাস্তি অপেক্ষা করছে?

এই উপত্যকা, এই আবাসস্থলগুলোর দিকে তাকাই। গাইয়ুন জাহান্নামের দুর্গন্ধময় উপত্যকা, যেখানে সকল নোংরা পুঁজ এবং মাংস গিয়ে জমা হয়। সাকার যে উপত্যকায় জাহান্নামী ব্যক্তির দেহের কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ওয়াইল সে উপত্যকা, যেখানে প্রাণীরা বাস করে এবং ওই প্রাণীগুলো জাহান্নামী ব্যক্তিকে খেয়ে ফেলে।

কুরআনের আরেক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

যখন তাদেরকে বলা হয়, নত হও, তখন তারা নত হয় না। সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য ‘ওয়াইল’ হবে। (সূরা মুরসালাত, ৭৭(৪৮-৪৯)

এমন ব্যক্তিদের আবাসস্থলও হবে ‘ওয়াইল’। এসব শাস্তি শুধু সালাতের ব্যাপারে অবহেলা, সঠিকভাবে, সময়মতো সালাত না পড়ার কারণে।

নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة....

“যে ব্যক্তি যথাযথভাবে সালাত আদায় করল না, তার জন্য কিয়ামতের দিন কোনো নূর, প্রমাণ এবং মুক্তি মিলবে না।” (ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ: ১৪৬৭)

যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না, কে হবে তার বন্ধু? কে হবে তার দোস্ত? তবে উল্লিখিত হাদীসের তৃতীয় অংশটি দেখুন,

وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبى بن خلف

“আর কিয়ামতের দিন সে ফেরাউন, হামান, কারুন ও উবাই বিন খালফদের সাথে থাকবে।

কারুন হলো মূসা আলাইহিস সালাম-এর বিরোধিতাকারীদের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তার কথা সূরা কাসাসে উল্লেখ করেছেন,

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ... أُولَى الْقُوَّةِ

‘কারুন ছিল মূসার সম্প্রদায়ভুক্ত। অতঃপর সে তাদের প্রতি জুলুম করতে আরম্ভ করল। আমি তাকে এত ধন-ভাণ্ডার দান করেছিলাম যার চাবি বহন করা একদল শক্তিশালী লোকের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল। (সূরা কাসাস, ২৮(৭৬)

আল্লাহ তাকে এত সম্পদ দান করেছিলেন যে, তার সম্পদ সংরক্ষণের চাবিগুলো বহন করতেই একটি কাফেলার প্রয়োজন হত !

আল্লাহ তার সম্পর্কে কুরআনে বলেছেন,

فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ
مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ()

“অতঃপর আমি কারুনকে ও তার প্রাসাদকে ধসিয়ে ভূগর্ভে বিলীন করে দিলাম। তার পক্ষে এমন কোনো দল ছিল না, যারা তাকে আল্লাহর বিপরীতে সাহায্য করতে পারে এবং সে নিজেও আত্মরক্ষা করতে পারল না। (সূরা কাসাস, ২৮(৮১))

যে সালাত আদায় করে না, সে জাহান্নামে কারুনের সঙ্গী হবে। তার আরেক সঙ্গী হবে ফেরাউন। সেই ফেরাউন, যে বলেছিল :

أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى ...

“আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রব। (সূরা আন-নাযিয়াত, ৭৯:(২৪))

কুরআনে উল্লেখিত সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলো ফেরাউন। ফেরাউনের মতো আরও অনেক লোক ছিল তবে আল্লাহ সবচেয়ে খারাপ জালিমের উদাহরণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন ফেরাউনকে। অনেক ফেরাউন আছে, প্রত্যেক যুগেরই ফেরাউন আছে, তবে যে ফেরাউনকে আল্লাহ তাআলা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, সে ছিল মূসা আলাইহিস সালাম-এর বিরোধী। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ফেরাউন বলেছিল,

أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى

“আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা।

যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না, জাহান্নামে তার সঙ্গী হবে কারুন এবং ফেরাউন। আল্লাহ আমাদের এমন অবস্থা থেকে হেফাজত করুন। একদিকে কারুন, অন্যদিকে ফেরাউন, আর সামনে থাকবে হামান। আমরা কি জানি, হামান কে? হামান ছিল ফেরাউনের ডান-হাত! প্রত্যেক খারাপ লোকেরই একটা সহযোগী, একটা সাগরেদ

থাকে। ফেরাউনের সহযোগী ছিল হামান। যে ফেরাউনকে খারাপ কাজে উৎসাহিত করত, উসকে দিত এবং সাহায্য করত। ফেরাউন হামানকে বলেছিল :

يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ • أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي
لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا

“হে হামান! তুমি আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, হয়তো আমি পৌঁছে যেতে পারব আকাশের পথে; অতঃপর উঁকি মেরে দেখব মূসার আল্লাহকে। বস্তুত আমি তো তাকে মিথ্যাবাদীই মনে করি। (সূরা গাফির, ৪০ : (৩৬-৩৭))

ফেরাউনের আদেশ অনুযায়ী হামান এক প্রাসাদ নির্মাণ করতে শুরু করেছিল। যদি আপনি আল্লাহর কাছে তাওবা না করেন এবং সালাত আদায় শুরু না করেন, তা হলে এই হামান, ফেরাউন, কারুন হবে আখিরাতে আপনার সঙ্গী। আসলে এই হাদীসটি ওইসব লোকেদের জন্যও, যাদের সালাত ছুটে যায়। যারা সঠিক সময়ে সালাত আদায় করে না, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত কাযা করে, তাদের জন্য। চিন্তা করুন, যারা সালাত আদায়ই করে না, তাদের ক্ষেত্রে কী ঘটতে যাচ্ছে! আমাদের পূর্ববর্তীদের সময়ে সালাত একেবারে ছেড়ে দিত এমন মানুষ পাওয়া যেত না। তারা বড়জোর সালাতের সময় নিয়ে হেলাফেলা করত। সেই সময়ে আজকের মুসলিম নামধারীদের মতো এমন মানুষ ছিল না, যারা একেবারে সালাতই আদায় করে না। এ কারণেই এই হাদীসে এত কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে ওই মানুষদের ব্যাপারে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে সালাতকে বিলম্বিত করে।

যারা সালাত আদায় করে না, তাদের জাহান্নামী সাথীদের মধ্যে আরও দুজন হলো আবু জাহল আর উবাই ইবনে খালফ। আবু জাহল হলো সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, সে হলো এই উম্মাহর ফেরাউন

আর উবাই ইবনে খালফ হলো একমাত্র লোক, যাকে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে হত্যা করেছেন। উবাই ইবনে খালফ ছাড়া আর কাউকে নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বহস্তে হত্যা করেননি। যে ব্যক্তি নিজের সালাতের হেফাজত করে না, সঠিকভাবে সালাত আদায় করে না, জাহান্নামে তার সঙ্গীসাথি হবে কারুন,

ফেরাউন, হামান, আবু জাহল, উবাই ইবনে খালফ। আমরা কি বুঝতে পারছি, সালাত আদায় না করা কতটা গুরুতর অপরাধ, কতটা বিপজ্জনক?

দুর্গন্ধময়, জ্বলন্ত গাইয়ুন উপত্যকা। সাকার যেখানে পুড়ে-যাওয়া ব্যক্তির কোনো হৃদিস থাকবে না। ওয়াইল যেখানে সাপ আর জন্তু-জানোয়ার জীবন্ত খেয়ে ফেলবে জাহান্নামীকে। কারন, হামান, ফেরাউন, আবু জাহল, আর উবাই ইবনে খালফ

সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষদের সান্নিধ্য... আমরা কি এমন পরিণতি চাই?

সালাতকে সালাফে সালাহীন কেমন মর্যাদাসম্পন্ন বিবেচনা করতেন

• সাঈদ ইবনে মূসাইয়্যিব রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন একজন বিখ্যাত তাবেয়ি ও আলিম। তিনি মৃত্যুশয্যায়, পাশে তাঁর কন্যা কাঁদছে। স্বাভাবিকভাবেই এমন পরিস্থিতিতে যে-কোনো সন্তানকে পিতা-হারানোর বেদনা ও কষ্ট গ্রাস করবে। তিনি তাঁর কন্যাকে সাঙ্ঘনা দিলেন। বললেন, কেঁদো না, আমি চল্লিশ বছরে এক ওয়াক্ত সালাতও ছেড়ে দিইনি।

দেখুন, মৃত্যুশয্যায় কোন বিষয়টির ওপর তিনি ভরসা করছেন। সাঈদ ইবনে মূসাইয়্যিব কে? দুনিয়াতে-আসা সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমদের একজন। তিনি কিন্তু বলেননি যে, আমি বহু লোককে ইলম শিক্ষা দিয়েছি, আমার এত-এত ছাত্র আছে এবং আমার-মাধ্যমে-প্রচারিত-ইলম কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তিনি এ বিষয়গুলোর ওপর ভরসা করেননি, এ বিষয়গুলোর কথা উল্লেখ করেননি। বরং, তিনি যে বিষয়টি নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার প্রত্যাশা করেছেন তা হলো তাঁর সালাত। তাই তিনি বললেন, কেঁদো না মেয়ে, আমি চল্লিশ বছরে কখনও এক ওয়াক্ত সালাতও ছেড়ে দিইনি।

• আল-আ'মাশ রাহিমাহুল্লাহ মৃত্যুশয্যায় বলেছেন, পঞ্চাশ বছর ধরে আমি ইমামের পিছনে সালাতের প্রথম তাকবীর থেকে সালাত আদায় করেছি। আমরা জানি জামাতে সালাত শুরু হয় ইমামের তাকবীরের মাধ্যমে। ইমাম আল্লাহ আকবার বলেন, এবং তারপর মুসল্লিরা আল্লাহ আকবার বলেন। পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি তাকবীরে উলার

সাথে জামাতে সালাত আদায় করেছেন। পঞ্চাশ বছরে এক রাকাত সালাতেও জামাতের এই প্রথম তাকবীর তিনি মিস করেননি।

• সাবিত ইবনে আমির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ছিলেন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবি যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাতি। যুবাইর ইবনুল আওয়্যাম ছিলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফুফাতো ভাই। তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরকেও সাহাবি বিবেচনা করা হয় যেহেতু তিনি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাঁর জীবদ্দশায় পেয়েছিলেন। সাবিত ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাতি। সাবিত(রা) যখন অত্যন্ত বৃদ্ধ, অসুস্থ এবং মৃত্যুশয্যা় শায়িত তখন তিনি মাগরীবের আযান শুনতে পেলেন। তিনি তাঁর সন্তানদের বললেন, আমাকে মসজিদে নিয়ে চলো। তাঁরা বলল, আপনার মসজিদে যাবার প্রয়োজন নেই। আপনি অসুস্থ, আপনার ওজর আছে।

আজ আমরা ঠিকমতো সালাত আদায় করি না, কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির জন্য শারীআতে যে প্রশস্ততা আছে, সেটার ব্যাপারে আবার আমরা অনমনীয়। কেউ যদি অসুস্থ হবার কারণে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে না পারে, তা হলে শারীআ তাঁকে বসে সালাত আদায় করার অনুমোদন দেয়। যদি কেউ বসে সালাত আদায় করতে না পারে, তবে সে শুয়ে সালাত আদায় করার সুযোগ পাবে। যদি কেউ এতটাই অসুস্থ হয়ে যে সে শুয়েও ঠিকমতো সালাত আদায় করতে পারছে না, তা হলে সে চোখের ইশারায় সালাত আদায় করতে পারবে। অর্থাৎ ইসলামি শারীআতে এ ব্যাপারে নমনীয়তা আছে। তবে সালাত আদায় করতেই হবে।

তাই সাবিত (রা)-এর সন্তানেরা তাঁকে বলল, আপনার মসজিদে যাবার দরকার নেই। এখানেই সালাত পড়ে নিন। সাবিত(রা) ঘরেই সালাত আদায় করতে পারতেন। এতে তাঁর গুনাহ হতো না। কারণ অসুস্থ হবার কারণে তাঁর বৈধ ওজর ছিল। কিন্তু তিনি বললেন, আমাকে মসজিদে নিয়ে চলো, তোমরা কি চাও **حي على الصلاة حي على الفلاح** শোনার পরও আমি মসজিদে না গিয়ে বাসায় বসে থাকি?

এ-কথা বলার পর তাঁকে মসজিদে নিয়ে যাওয়া হলো। তাঁর মৃত্যু হলো মসজিদেই।
মাগরীবের সালাতের শেষ সিজদায় থাকা অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করলেন।

তিনি একটি উত্তম মৃত্যু লাভ করলেন। এর কারণ হলো তিনি সর্বদা আল্লাহকে বলতেন,
হে আল্লাহ! আমাকে উত্তম মৃত্যু দান করুন। কেন এই মৃত্যুকে আমরা উত্তম মৃত্যু
বলছি? কারণ সিজদারত অবস্থায় যে মানুষ মৃত্যুবরণ করল, কিয়ামতের দিন সে
পুনরুত্থিত হবে সিজদারত অবস্থায়। আর কিয়ামতের দিন সিজদারত অবস্থায় ওঠা
নিশ্চয়ই উত্তম অবস্থা।

•উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে কাদিসিয়্যার
যুদ্ধে পাঠালেন। কাদিসিয়্যার যুদ্ধ ছিল ইসলামের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এবং
গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধগুলোর অন্যতম। এ যুদ্ধে পাঠানোর আগে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি
সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস-এর প্রতি উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নসিহা কী ছিল,
জানেন? তিনি তাঁদের বর্ম, তলোয়ার আর তিরগুলোর ব্যাপারে প্রশ্ন করেননি। এগুলো
নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না উমার (রা)। উমার (রা) চিন্তিত ছিলেন সালাত নিয়ে। তিনি
বলেছিলেন, সাদ, সবাই যেন সময়মতো সালাত আদায় করে তা নিশ্চিত করতে হবে।
কেননা আমরা পরাজিত হই আমাদের পাপের কারণে।

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

“তোমাদের ওপর যেসব বিপদ-আপদ পতিত হয়, তা তোমাদের কর্মেরই ফল এবং
তিনি তোমাদের অনেক গোনাহ ক্ষমা করে দেন।” (সূরা আশ-শূরা, ৪২:৩০)

সালাত ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে বড় গুনাহ আর কী? আজ উম্মাহর মাঝে আমরা যে
সমস্যাগুলো দেখি, এগুলোর কারণও হলো আমাদের গুনাহ। বিজয়ী হতে হলে,
আমাদের এ গুনাহগুলো বন্ধ করতে হবে। প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য
বাহিনী প্রেরণের সময় উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সবচেয়ে বেশি চিন্তা ছিল সময়মতো
সালাত আদায় করা নিয়ে। সালাত কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এই ঘটনা তার প্রমাণ।

•সালাতের সাথে সম্পর্কিত উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আরেকটি ঘটনা বলি । উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সব সময় দুআ করতেন, হে আল্লাহ! আমি মদীনায় মৃত্যুবরণ করতে চাই এবং শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে চাই। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করত, উমার! আপনি মদিনায় কীভাবে শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করতে চান যখন মদীনাতে কোনো জিহাদ নেই? মদীনা তো বিজয়ী শহর, মদীনা ইসলামের ঘাঁটি। এখানে কোনো যুদ্ধ নেই। তা হলে কীভাবে মদীনাতে কারও পক্ষে শহীদ হওয়া সম্ভব? তবুও উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সব সময় এ দুআ করতেন ।

ফজরে তিনি সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করতে পছন্দ করতেন। একদিন ফজরের জামাতের সময় তিনি সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করছিলেন। এমন সময় আবু লু'লুআহ মাজুসি নামের এক লোক দুদিকে ধারালো-বিষ-মাখানো এক খঞ্জর নিয়ে আক্রমণ শুরু করল । উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে সে বিদ্ধ করল ওই খঞ্জরের বিষাক্ত অংশ দিয়ে । উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু মাটিতে পড়ে গেলেন । প্রথম রাকাতের পর লোকজন তাঁকে সরিয়ে নিয়ে গেল ধরাধরি করে।

পরিস্থিতিটা কল্পনা করুন।

ফজরের জামাত চলাকালীন সময়ে মুসলিম বিশ্বের নেতা আক্রান্ত হয়েছেন। মারা যাচ্ছেন। এমন সময়ও মুসলিমরা সালাত ভাঙল না। তাঁরা সালাত চালিয়ে গেল। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু পড়ে যাবার পর আবদুর রহমান ইবনে আউফ প্রথম কাতার থেকে ইমামের জায়গায় চলে আসলেন । সালাত শেষ হলো তাঁর ইমামতিতে । তবে অবশ্যই অল্প কিছু-সংখ্যক মুসল্লি সালাত ছেড়ে আততায়ীকে নিরস্ত্র করেছিলেন এবং মনোযোগ দিয়েছিলেন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে। সালাতকে তাঁরা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

সালাতের পরে তাঁরা উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাঁকে শরবত পান করানো হলো কিন্তু সেটা তাঁর শরীরের পাশের ক্ষতস্থান দিয়ে বেরিয়ে এলো। তিনি বারবার জ্ঞান হারাচ্ছিলেন। প্রতিবার জ্ঞান ফিরে পাবার পর

প্রশ্ন করছিলেন, আমি কি সালাত আদায় করেছি? তাঁকে বলা হচ্ছিল, উমার! আপনি এক রাকাত আদায় করেছেন। এ-কথা শোনার পর ফজরের দ্বিতীয় রাকাত সালাত আদায়ের জন্য ওই অবস্থাতেই তিনি আল্লাহ্ আকবার বলছিলেন। কিন্তু এটুকু বলেই আবার অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন শরীরের আঘাত আর বিষের প্রভাবে। তারপর আবার জ্ঞান ফিরে পেয়ে তিনি প্রশ্ন করছিলেন, আমি কি সালাত আদায় করেছি? ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম বর্ণনা করেছেন, ফজরের সালাত আদায় শেষ না করা পর্যন্ত তিনি এরূপ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় রাকাত শেষ করতে পেরেছিলেন। দেখুন, এমন অবস্থাতেও তবে তাঁর হৃদয়ে ছিল সালাত, এক রাকাত সালাত ছুটে যাবে এটা তিনি কোনোভাবেই মানতে পারছিলেন না।

→এইসব ঘটনা আমাদের জন্য লজ্জা,যারা আমরা সালাতকে বুঝা মনে করি।যেন কোনরকম সালাত আদায় করে শেষ করতে পারলে বাচি।আল্লাহুম্মাহফিরলী।অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মধ্যে সুখ,প্রশান্তি খুজে পেতেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

“সালাতে আমার চোখের শীতলতা রাখা আছে।” (নাসাঈ,আস-সুনান:৩৯৩৯)

তিনি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলেছিলেন,

أرحنا بها يا بلال

“সালাতের মাধ্যমে আমাদেরকে শান্তি ও স্বস্তি দাও হে বিলাল। (আবু দাউদ,আস-সুনান:৪৯৮৫)

• কুতাইবা ইবনে মুসলিম-এর নেতৃত্বে আমাদের পিতামহরা যখন আফগানিস্তান বিজয় করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের ছিল এক লাখ সেনাবিশিষ্ট এক বিশাল বাহিনী। যুদ্ধের আগে এক লক্ষ যোদ্ধাবিশিষ্ট বাহিনীর সেনাপতি কুতাইবা ইবনে মুসলিম সালাতে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বিজয় দান করুন। সালাত শেষে শত সহস্রের বাহিনীর দিকে তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, মুহাম্মাদ

ইবনে ওয়াসি কোথায়? উত্তরে বলা হলো, এক লক্ষ লোকের মাঝ থেকে মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসিকে আমরা কীভাবে খুঁজে বের করব? তাঁকে এখন খুঁজতে গেলে তো পুরো দিন পেরিয়ে যাবে।

সেনাপতি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল। আমি মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসিকে দেখতে চাই। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শেষতক মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসিকে খুঁজে পাওয়া গেল। নির্জনে সালাত আদায়রত অবস্থায়। তিনি সালাত আদায় করছিলেন আর আঙুল তুলে বারবার দুআ করছিলেন, হে আল্লাহ! আমাদের বিজয় দান করুন। হে আল্লাহ! আমাদের বিজয় দান করুন। এ দৃশ্য দেখার পর কুতাইবা বললেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসির এই আঙুলই দেখতে চাচ্ছিলাম।

শত সহস্রের বাহিনীর চেয়েও আল্লাহর কাছে সালাতে-উঁচু-করা মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসির আঙুল আমার কাছে বেশি দামি। তারপর তিনি মুসলিম-বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হবার আদেশ দিলেন। এই সালাতই আমাদের বিজয়ী করে এবং আলোকিত করে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতকে।

•খন্দকের যুদ্ধে, দশ হাজারের এক বাহিনী নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আক্রমণ করতে এলো। এত বড় বাহিনী ওই সময় সচরাচর দেখা যেত না। শত্রু বাহিনী আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য মুসলিমরা পরিখা খনন করলেন। পরিখা খোড়ার উদ্দেশ্য ছিল শত্রুবাহিনীকে দূরে রাখা। কারণ দশ হাজারের মোকাবিলায় মুসলিমদের সংখ্যা ছিল এক হাজারেরও কম। পরিখার একটি জায়গায় ঠিকভাবে খনন করা বাকি ছিল। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, শত্রুরা সেদিক দিয়ে আসার চেষ্টা করছে। সাহাবিদের নিয়ে দ্রুত সেখানে গিয়ে তিনি জায়গাটি খনন করতে শুরু করলেন। শত্রুর মোকাবিলা এবং পরিখা খুঁড়তে খুঁড়তে পার হয়ে গেল আসরের সালাতের সময়। এটি ছিল বৈধ ওজর, কিন্তু নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মর্মান্বিত হয়ে বললেন,

مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ نَارًا كَمَا شَعَلُونَا عَنْ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى

“আল্লাহ তাদের ঘর এবং অন্তরসমূহকে জাহান্নামের আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিক, যেভাবে তারা আমাদেরকে আওয়াল ওয়াত্তে আসরের সালাত থেকে দূরে রেখেছে। (বুখারী,আস-সহীহ:৪১১১)

এ ঘটনা গুলো থেকে বুঝা যায়, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম প্রজন্মের মানুষগুলোর কাছে সালাত কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

শেষ কথা

আমরা সালাতের ব্যাপারে অথবা সালাত জামা‘আতের সাথে আদায়ে বা ফজরের সালাতে অলসতা করে থাকি তবে হঠাৎ চলে আসা সমস্ত স্বাদ সাজ্জকারী সকল জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্নকারী মৃত্যু গ্রাস করার পূর্বেই আমরা একান্ত তাওবা করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হয়। নতুবা আমাদের জন্য অবশিষ্ট থাকবে শুধু আফসোস আর লজ্জা। নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করি:

﴿قُلْ يُعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥٣ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ٥٤ وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥٥ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يٰحَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّخِرِينَ ٥٦ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٥٧ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٨﴾ [الزمر: ٥٣، ٥٨]

“বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তোমাদের রবের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর তোমাদের নিকট শাস্তি আসবার পূর্বে; অতঃপর তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না। অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের নিকট থেকে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার, তোমাদের ওপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে। যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি

যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস! আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। অথবা কেউ যেন না বলে, আল্লাহ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা, যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাভর্তন ঘটত তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৩-৫৮]

উল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে সমস্ত গুনাহ-খাতা থেকে তাওবা করার নির্দেশ দিচ্ছেন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করার ওয়াদা করছেন। কিন্তু তাওবা করার পরে কি করা উচিত? আমাদের একান্ত কর্তব্য হলো, আমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাভর্তন করব, তাঁর বিধি-বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ করব এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণের মাধ্যমে আনুগত্য প্রকাশ করব। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে তাওবার ক্ষেত্রে গড়িমসি করা থেকে সাবধান করুন। কেননা মৃত্যু এমন সময় এসে পড়বে যে মানুষ তা বুঝতেও পারবে না, পরে তার জন্য আফসোস ও লজ্জা ব্যতীত আর কিছু থাকবে না।

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُحَسِّرُنِي عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ৫৬]

“যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস!” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৫৬]

সালাতে শিথিলতাকারী বলবে: হায় আফসোস! আমি সালাতে বা সালাতের জামা‘আতে, ফজরের সালাতে বা তা ব্যতীত আল্লাহ এবং রাসূলের অনুসরণে শৈথিল্য করেছি। আর ঐ ব্যক্তি স্বীয় গুনাহ-খাতার জন্য আফসোস করবে।

অতএব, আমাদের সবার কর্তব্য, আল্লাহ তা‘আলার নিকট তাওবা করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ৩১]

“হে মুমিনগণ তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরা আন-নূর: ৩১)

অতীতের ব্যাপারে অনুশোচনা, এখনই সালাত আদায় শুরু করা এবং ভবিষ্যতেও নিয়মিত সালাত আদায় করতে থাকার প্রতিজ্ঞার কারণে, আল্লাহ আমাদের পূর্বের সমস্ত গোনাহকে নেকিতে পরিবর্তন করে দেবেন।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“কিন্তু যারা তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গোনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[৮৪]

(সুরা ফুরকান, ২৫:৭০)

তথ্যসূত্র

*আমার সালাত

(মুফতি মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন হাফি)

*ফিকহুস সালাত

(মুফতি আরিফুল ইসলাম হাফি)

*সালাত

নবীজির শেষ আদেশ

(শাইখ আহমাদ মূসা জিবরীল হাফি)

*নামায শিক্ষা ও ইমামগনের জিম্মাদারি

(মুফতি মনসূরুল হক হাফি)

*<https://www.alkawsar.com/bn/qa/answers/>

*<https://www.hadithbd.com/books/fullbook/?book=104>

*<https://ifatwa.info/>

(আমার দুর্বলতা,কমতি,ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।

দোয়ায় স্বরন রাখবেন এই গোনাহগার বান্দিকে,আমার আব্বা আম্মাকে।)

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
اٰجْمَعِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ <https://www.academia.edu/111542599/>

